(নবপর্য্যায়)

সম্পাদক

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ।

বীরভূম-সাহিত্য-পরিষদ।

বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকগণ।

১৩১৭।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমার রামেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর।

সহ-সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত কুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, হেতমপুর; শ্রীযুক্ত নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর; শ্রীযুক্ত কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায় বি, এল, সরকারী উকীল, সিউড়ি; শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, সিউড়ি; শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, সুলতানপুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মিশ্র বি, এল, উকীল।

সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, সব ডেপুটী কালেক্টর, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র; শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ (মাসিক পত্রের সম্পাদক)

ধন রক্ষক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, জমিদার ও উকিল সিউড়ি;

গ্রন্থ রক্ষক—শ্রীযুক্ত শিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল।

আয় ব্যয় পরীক্ষকগণ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভৌমিক এম, এ, বি, এল, উকীল; শ্রীযুক্ত লালা মৃত্যুঞ্জয় লাল বি, এল, উকীল।

ছাত্র সভা পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

পুথি সংগ্রাহক ও মাসিক পত্রের এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়।

এতদতিরিক্ত নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য—

শ্রীযুক্ত যুগলবিহারী মাকড় এম, এ, বি, এল, উকীল, রামপুরহাট; শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু এম, এ, বি, এল, উকীল, বোলপুর; শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ বি, এল, উকীল বোলপুর; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল, দুবরাজপুর; শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন চৌধুরী বি, এল, সিউড়ি, শ্রীযুক্ত চারুশশী চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস, সিউড়ি; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী 'বীরভূমবার্ত্তা'র সম্পাদক সিউড়ি; খান বাহাদুর মৌলভী সামসুজ্জোহা বি, এ, জমিদার, সেকেন্দা; শ্রীযুক্ত রাখহরি সেন জমিদার, করিধা; শ্রীযুক্ত ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরন্দরপুর।

শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক

নামক সুবৃহৎ ও সচিত্র চরিতাভিধান গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত—

(১) বাংলা সাহিত্যের সমস্ত পরলোকগত গ্রন্থকারদিগের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব দূর করিয়াছেন। সাহিত্যিকদের জীবন ও রচনা সম্বন্ধে এরূপ সুবিস্তৃত সঙ্কলন-গ্রন্থ (Reference Book) বাংলায় আর দেখি নাই—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) আপনার পরিশ্রমের ফলে একখানি সুন্দর গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্য আলোকিত হইতেছে * * আপনার অনুসন্ধানের প্রাসর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম—শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

(৩) সাহিত্যামোদী মাত্রেরই এরূপ একখানি গ্রন্থ থাকা আবশ্যক। এরূপ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের আদর না হইলে দেশের পক্ষে তাহা নিতান্তই দুর্ভাগ্য ও কলঙ্কের কথা * * * বঙ্গ ভাষার যে মহদুপকার সাধন করিতেছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এপ্রকার গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এই প্রথম—"প্রবাসী"

(৪) শিবরতন বাবু আজীবন এই কার্য্যে ব্যয় করিয়া যে রত্ন সাহিত্য ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই -"নবভারত"

(৫) "সাহিত্য-সেবককে" বঙ্গ সাহিত্যের "রত্ন মঞ্জুষা" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—"সময়"

(৬) শিবরতন বাবুর রচনায় মাধুর্য্য আছে, বর্ণনায় সংযম আছে। তাঁহার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান আছে, কার্য্যে একাগ্রতা আছে, প্রাণে উৎসাহ আছে—সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি আছে। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যের "কোহিনূর"—"বীরভূমি"

হস্তলিপি লিখন-প্রণালী।

শ্রীশিবরতন মিত্র প্রণীত।

অভিনব বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিবিধ চিত্র দ্বারা শিশুদিগকে অতি সুন্দর ভাবে লিখন-প্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। একসঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং ধারাপাত শিক্ষা হইবে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—গ্রন্থকার, বীরভূম।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত।

'প্রেম'—৸০, 'জীবন'—।০, 'হৃদয় ও মনের ভস্ম'—।০, 'আমি'—১৲।

প্রাপ্তিস্থান—৭১/১ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"বীরভূমি"র নিয়মাবলী।

১। "বীরভূমি" বীরভূম সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র।

২। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ চারি আনা। পরিষদের সভ্যগণ ইহা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

৩। প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে "বীরভূমি" নিয়মিতভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহা মাসিক এক সহস্র করিয়া মুদ্রিত হয়।

৪। অশ্লীল ও অসত্যমূলক বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৫। প্রবন্ধাদি পত্রিকা সম্পাদকের নামে ও টাকা কড়ি বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

৬। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট না পাঠাইলে ফেরত দেওয়া হয় না। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা প্রবন্ধ গৃহীত হয় না।

শ্রীশিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এল।

প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ, সিউড়ি, বীরভূম।

সূচীপত্র

(১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১৮)

মহম্মদবাজার লৌহ-কারখানা

(নবপর্য্যায়)

১ম বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩১৮ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

সেবা।

অনন্ত মহাসমুদ্রের বুকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে—কবে এই মহালীলা আরম্ভ হইয়াছে, কবে বা এই মহালীলার অবসান হইবে, তাহা কেহই জানে না, কেবল তরঙ্গের পর তরঙ্গ। এই সুমহান্ নৃত্যলীলার কর্ত্তা কে? কে নাচিতেছে—মহাসমুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতেছে, কি তরঙ্গগুলি সমুদ্রের উপর নাচিতেছে?

সমুদ্রের তীরপ্রদেশে শৈবালাচ্ছন্ন মলিন-নীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়গুলির চারিদিকে সুদৃঢ় বাঁধ, তাহারা সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তরঙ্গগুলির অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে উপহাস করিতেছে। তরঙ্গগুলির সে উপহাসে মনযোগ করিবার অবসর নাই, তাহারা উচ্ছল আনন্দের আবেগে খল্ খল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে তীরস্থ শৈলগাত্রে আছড়াইয়া পড়িতেছে, চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক নিমেষে এমনি করিয়া যে কত শত তরঙ্গ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই—কে তাহাদের গণনা করিবে?

রুদ্ধ জলাশয় ভাবিতেছে ঢেউগুলি কি মূর্খ, তাহারা নিজের চারিদিকে আমাদের মত একটা করিয়া গণ্ডী প্রস্তুত করিতে পারিল না, তাহাদের জীবন সার্থকতাহীন। জলাশয়গুলির রুদ্ধ জল যতই পঙ্কিল, যতই পল্বলময় হইতেছে,

যতই তাহার দূষিত জলে শত শত ক্রমি আসিয়া বাস-স্থাপন করিতেছে, জলাশয় গুলি ভাবিতেছে যে তাহারা ততই গৌরবময়, ততই যশস্বী, ও ততই লাভবান হইতেছে—আর ভাবিতেছে আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি আর মূর্খ ঢেউগুলি মরিয়া মরিয়া যাইতেছে।

মহাসমুদ্রের এই তরঙ্গগুলির মত কে মরিতে চায় আর এই রুদ্ধ জলাশয়-গুলির মত কে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক? আমি, তুমি প্রভৃতি কোটি কোটি মানব আজি এই সংসারে আসিয়াছি, আমাদের পূর্ব্বে এমনি আরও কত কোটি কোটি মানব আসিয়াছিল, কে তাহাদের সংখ্যা করিবে! আবার আমরা চলিয়া যাইব আমাদের মত কোটি কোটি নূতন মানব আসিয়া সংসার রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিবে?

বিশ্বনাথের মানস সমুদ্র অসীম ও অনন্ত। ঐ মহাসমুদ্রে তরঙ্গমালার উত্থান পতনের মত কত ব্যাস, বাল্মিকী, কত হিরণ্যকশিপু রাবণ, কত বুদ্ধশঙ্কর চৈতন্য, এই সমুদ্রে উঠিয়া পড়িয়া নৃত্য করিয়া গিয়াছেন। অনাদি, অনন্ত, এই তরঙ্গ লালা।

সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র হইতে আপনাকে পৃথক করিল, সমুদ্রের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে উচ্চ বাঁধ বাঁধিয়া আপনাকে বদ্ধ করিল—সে জলাশয় হইয়া পড়িল। সে ভাবিল আমি কৃত-কার্য্য হইলাম, আমি যশস্বী হইলাম, বিজয় মুকুটের গৌরব -কমলে আমার মস্তক শোভিত হইল। সে ভাবিয়াও দেখিল না যে তাহার এই কৃতকার্য্যতার মধ্যে কত বড় বিফলতা, তাহার এই যশোলাভের মধ্যে কত বড় অগৌরব, তাহার এই বিজয় গর্ব্বের মধ্যে কত বড় পরাজয়! হায় তরঙ্গ! তুমি জলাশয় হইলে, তুমি বাঁচিয়া থাকিবার আশায় মরণের যাতনাময় ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলে! হায় জলাশয়! তুমি যে তরঙ্গ—তুমি যে মহাসমুদ্রের তরঙ্গ, তুমি মরণের মধ্য দিয়া জীবনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে না।

কে বলিল এই তরঙ্গগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে—এই তরঙ্গগুলির জীবন ধ্বংশ হইয়া যাইতেছে? কোথায় তাহাদের জীবন?—তরঙ্গের যথার্থ জীবন মহা সমুদ্রে। আমি যেমন একটি মানুষ আমার মনে শত শত চিন্তার তরঙ্গ জাগিতেছে—ভবিষ্যতে আরও কত তরঙ্গ জাগিবে—এই সমস্ত চিন্তা যেমন আমার আমিত্বের মধ্যে নিত্য জীবনে সমাধিলাভ করিতেছে—তেমনি এই তরঙ্গ-মালা এক সুমহান মহাসমুদ্রের মহাজীবনে চিরদিনই বাঁচিয়া রহিয়াছে। একটি তরঙ্গও নষ্ট হয় নাই, অতীতের সেই তরঙ্গগুলি যাহারা নাচিতে নাচিতে নির্ম্মম

শৈলগাত্রে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যাহাদের দেখিয়া তীরের পল্বলময় রুদ্ধ জলাশয়গুলি উপহাস করিয়াছিল, সেই তরঙ্গগুলিই আজিকার এই তরঙ্গগুলির মধ্যে জাগিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। সুদূর ভবিষ্যতেও আবার এই ঢেউগুলিই উঠিবে ও পড়িবে, খল্ খল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে শুভ্র ফেনের অতি ক্ষীণ রেখামাত্র তীরদেশে অঙ্কিত করিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে।

মানব মাত্রেরই সত্তা ভাবময়। প্রত্যেক সত্তার, প্রত্যেক ঘটনার, প্রত্যেক কার্য্যের এই যে ভাবটুক ইহাই নিত্য, ইহাই অবিনাশী। বিশ্বের এই শাশ্বত ভাবটুকুর সহিত যাঁহার পরিচয় হইয়াছে তিনিই ভাবুক। এই ভাবের মধ্যেই আমাদের অনন্ত জীবন—আমাদের শাশ্বত বৃন্দাবন। অভাবের মধ্য হইতে ভাবের মধ্যে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে।

হে ঈশ্বর! আমাদের এই ক্ষুদ্র সামর্থ্যের স্কন্ধদেশ আশ্রয় করিয়া তোমার যে শাশ্বত ভাবটুকুকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছ, সে ভাবটুকুর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দাও। আমরা নিজেদের জন্য যেন কৃত-কার্য্যতা বা বিজয় অন্বেষণ না করি। হে মহাসমুদ্র আমাদের এই জীবনতরঙ্গ সমূহকে তোমার অবিনাশী সত্ত্বায় সার্থক কর। আমরা যেন বুঝিতে পারি

"কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি পুনঃ তোঁহে মিলায়ত,
সাগর লহরী সমানা।"

হে মহাসমুদ্র! আমাদের এই অতি সামান্য সাহিত্য সাধনা তোমার বক্ষের তরঙ্গ হউক। আমরা যেন আমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণাগুলিকে এই তরঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারি। অনন্ত বিশ্ব জুড়িয়া কত দিকে কত শত বড় বড় তরঙ্গ উঠিতেছে, সুদূর অতীতে কত বড় বড় তরঙ্গ উঠিয়াছে, আজিকার এই সিন্ধু-গর্জ্জনের মধ্যেও সেদিনকার সেই কল্লোল শ্রুত হইতেছে—আমদেরও এই সাধনাকে একটি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ করিয়া লও। সম্মুখে নিস্মম ও অতি ভীষণ শৈলশ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে—আমরা তাহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে পারি, খল্ খল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে চূর্ণ হইয়া যাইতে পারি—আমাদের এই খল্ খল্ হাস্যের প্রতিধ্বনি লইয়া প্রতিবন্ধকতার পাষাণ স্তূপ আমাদিগকে বিদ্রূপ করুক আমাদের কোনই দুঃখ নাই।—অতি আনন্দের সহিত আমরা চূর্ণ হইয়া যাইব—কেবল মাত্র যদি হে অনন্ত সত্য! তোমার উদার ও মহিমাময় মুর্ত্তি একটিবার মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের হৃদয়-দর্পণে

প্রতিফলিত করিয়া দাও। আমরা তোমারই সেবক, তোমার সেবাতেই আমাদের অধিকার—গৌরবের ও বিজয়ের কমলহার গলে পড়িয়া আমরা রুদ্ধ জলাশয় হইতে চাহি না। আমরা যতই নগণ্য, যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, আমাদের অস্তিত্ব যতই ক্ষণস্থায়ী হউক না কেন, তোমার বক্ষ ছাড়িয়া যেন অহঙ্কারের সীমার মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ি। তাহা হইলেই আমরা ধন্য হইব।

আষাঢ়ের আকাশ।

হে নব বরষার দিন, আজ এই দিনের আলো নিভিয়ে দিয়ে কত যুগ যুগান্তের বিষাদ রাশি বহন করে, চারিদিক হ'তে ঠিক আবার তেমনি করে তুমি এসেছ। শরতের শুভ্র জ্যোছনায় যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বসন্তের কুসুমগন্ধে যে নিশ্বাস ফেলিয়াছিল, আজ কি তাহারি অশ্রুধারা সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া অবিরাম ঝরিয়া পড়িতেছে? এই যে পূবের হাওয়া রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে ইহার মাঝে কি তাহারি পীড়িত চিত্ত গুমরিয়া উঠিতেছে? কি আঁধার করেই তুমি এসেছ!

বর্ষণোৎসবের পরিপূর্ণ মহিমায় আজ তোমার আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত ভরিয়া গিয়াছে। আজ সেথা আলো নাই, গীত নাই, গন্ধে ভরা হাওয়া নাই। আমারো আজ অনেক নাই। কিরণের স্বর্ণবীণা তোমার আকাশকে আজ মুখরিত করে না, আমারো হৃদয়ে কেবল একটা বেদনার মূর্চ্ছনা কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রায় স্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। ঐ জ্বালাময়ী বিদ্যুৎ রেখা ক্ষণে ক্ষণে সমস্ত ঝড় বাদল, সমস্ত অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে—আমার হৃদয় আকাশেও ঠিক তেমনি। * * নির্নিমেষ আঁখিতে চেয়ে আছি। হে বরষা, হে মেঘ বিদ্যুৎ অন্ধকারে ভরা আকাশ, তোমায় আমি শুধু বাহিরে দেখিতেছি না। তুমি বাহির হইতে অন্তরে আসিতেছ, আবার অন্তর হইতে বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতেছ। হৃদয়ে বাহিরে এই যে আনাগোনা, এই যে যাওয়া আসা—এই বিচিত্র প্রহেলিকার কোন উত্তরই আমি জীবনে খুঁজিয়া পাইতেছি না। বাহিরে কি শুধু আমি অন্তরেরি একটা ছবি দেখিতেছি—অথবা এই অন্তর, বাহিরের শুধু একটা কঙ্কালসার ছায়া মাত্র! কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা ছায়া, ওগো কোন্‌টা তুমি, কোন্‌টা মায়া? তবু আজ অন্তরে ও বাহিরে আমি এক দেখিতেছি— একি রূপ, একি আশা, একি ভাব, একি ভাষা!

আজি এমন ভরা বাদলে হৃদয় তটপ্রান্তে আসিয়া একাকিনী কেহ দাঁড়ায় নাই। আজ এই বরষায় অভিসারিকা কেহ,—নির্জ্জন ঘন বনপথ দিয়া চলে না। আজ বিরহ, আবেশে ঘনাইয়া আসে নাই। আসিবে কোথায়? সে যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ বিরহের সমস্ত বেদনা এই দ্যুলোকে ভূলোকে, এই গর্জ্জনে, প্লাবনে এই বর্ষণোৎসবের মাঝখানে, বাধা মুক্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ কোন গোপন কথা নাই, আজ কোন লাজ ভয়, সুগোল কপোলমূলে সায়াহ্নের রক্তিম আভা আঁকিয়া তুলে নাই। আজি শুধু গর্জ্জন, শুধু বর্ষণ, আর থেকে থেকে আকাশের প্রান্তদেশে কি ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ! * * * বরষা, তুমি কি সেই বরষা?

নিখিল প্রকৃতিতে আজি এক মহা উৎসবের দিন। আজি নদী পর্ব্বতে, বনে প্রান্তরে বরষার কি সম্মিলন। মানব প্রকৃতিতে যে নিখিল প্রকৃতির বিকাশ হইয়াছে এই উতলা আর্দ্র হাওয়ার, এই জনহীন সুবিপুল স্তব্ধতায়, আর এই অতি স্নিগ্ধ ঘন বরিষণে, সেখানে ও কি এক অন্ধ আকুলতা, কি এক জলভরা মেঘ, কি এক পুঞ্জীভূত কালো ছায়া, কত কি স্বপ্ন মাধুরী কত কি মায়ারাজ্য পলকে সৃষ্টি করিতেছে, আবার পলকে উড়াইয়া দিতেছে। প্রকৃতি যখন ছুটিয়া চলে মানুষ কি তখন একেলা বসিয়া থাকিতে পারে! হায়, এই প্রকৃতি চিরদিন জড়াইয়া রাখিতে চায়, নিত্য নব বৈচিত্র্য—এই সুখ দুঃখ এই পাপ পুণ্য, এই হাসি অশ্রুর মধ্য দিয়া কি এক প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে নিয়ে যায়। তবে মুক্তি কোথায়? আজ এই বরষার দিনে সমস্ত ভুলিয়া আকাশে চাহিয়া বার বার এই কথাই ভাবিতেছি, তবে আমার মুক্তি কোথায়? এমন করিয়া কতদিন? ওগো, আমি মুক্তি চাই, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও।

কে তুমি, দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আমার জীবনকে লইয়া এই ভাঙ্গা গড়া করিতেছ? অনেক তোমায় সাধিয়াছি, অনেক আমি কাঁদিয়াছি তবু কি তোমার হয় নাই? শোণিত-পিপাসু লোলজিহ্বা ক্রমাগতই প্রসারিত করিতেছে, বিন্দু বিন্দু করিয়া আমায় শুষিয়া লইতেছ। কে তুমি, বল, আজ আমি শুনিতে চাই, কি তোমার চরম অভিলাষ? গোপন করিও না। লাভ কি? যদি আমার জীবন পেলে তুমি ধন্য হও, তুমি সার্থক হও, তবে হে ভীরু কেন চোরের মত আসিয়া দাঁড়াও? আমি ত্যাগ করিতে জানি। কেন চাহিতে সাহস কর না, কেন ভয় পাও? সংসার যাহাকে আঁকড়াইয়া থাকে, আমি যে তাহাকে অনায়াসেই ফেলিয়া দিতে পারি। তবু তুমি কাছে আসনা, আমি

চোখে চাহিতেই এই আকাশে, বাতাসে আঁধারে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যাও খুঁজিয়া পাই না।

আজি এই বরষার দিন, বড় নিস্তব্ধ। চারিদিক হইতে কি যেন একটা মসীকৃষ্ণ ভাব, আমার জীবন হইতে খানিকটা অংশ মুছিয়া দিবার জন্য ঢাকিয়া দিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে। আমি বুঝিতেছি, আর ভাবিতেছি: এমন সময় তুমি শান্ত হইয়া একবার আমার কাছে ব'স। বসে শুন। দেখ, এই চাঞ্চল্য কিছু নয়, এই ছুটাছুটী মাতামাতি, অতি অকিঞ্চিৎকর। নিখিল বিশ্বে যেখানে যা আছে, তা তেমনি আছে, তোমার বা আমার লাভে সেখানে কিছু বাড়ে না, তোমার বা আমার ক্ষতিতেও সেখানে কিছু কমে না। জীবনের পথে, রে মুগ্ধ বিহ্বল, আত্ম-বিস্মৃত পান্থ! নিজের সুখ দুঃখকে কেন্দ্র করে এই অনন্ত স্থান ও কালব্যাপি, কার্য্য কারণের প্রচণ্ড লীলার উপর পরিধি টেনো না। পলক ফেলিতে তুমি কোথায় ভেসে যাবে—আজিকার এই বর্ষণের মুখেই বা যদি তুমি ডুবে যাও, তবে কে তোমার খোঁজ নিবে? সে কতক্ষণ? হায় মূঢ়; কি আসক্তি! পরকাল? কিসের বিশ্বাস—আজ পর্য্যন্ত কি কেউ তার কথা ফিরে এসে বলেছে! এখানে বসে যারা কল্পনা করে, তারা শুধু কল্পনা করে—তারা সান্ত্বনা দেয় তারা ভাবিয়া শেষ পায় না, অথচ শেষ একটা কিছু করিতে চায়। তাই বলি পরকালে কিসের বিশ্বাস? মৃত্যুর পরেও যদি একান্ত রাখিতে চাও তবে তা'ত এখানে ও হ'তে পারে। বিশ্ব-মানব-চিত্ত -সমুদ্রে এমন তরঙ্গ তুলিয়া যাইতে পার যাহা অনন্তকাল না হো'ক ভবিষ্যের বহু শতাব্দীকে জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রেমে আশ্বাস ও অভয় দিতে পারে—এই বিশ্ব মানবের সেবাই ত পূজা, এইতো ধর্ম্ম, এই যে ক্ষুধিত, রুগ্ন, কঙ্কালসার—এই ত বহু রূপে তোমার সম্মুখে। তা ছেড়ে কোন্ আলেয়ার পশ্চাতে রে মোহান্ধ, কোথায় ছুটেছ? বিশ্ব-মানবই যে সব, আর যে কিছু নাই তা কে বলে? তবে মানুষকে যে ঘৃণা করে তার ঈশ্বরে ভক্তি অসম্ভব। হায় মানুষ, যা চোখের সম্মুখে দেখ,—বুঝ, যা দেখে বুক ফেটে যায়, চোখে-জল আসে; তাকে ফেলে কোন্ দূরে, কি অন্ধ বিশ্বাসে এক অতি অনিশ্চিতের পশ্চাতে ছুটে যাও, যার সম্বন্ধে আজো কত সন্দেহ, কত অবিশ্বাস—বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। তা যাক্।

আমি কি বলিতে চাই? সব আজ বলিতে পারি না, আর এক দিন বলিব। সব বুঝি বলাও যায় না। তবে আজ আমি এই বিশ্বে 'ছাড়া'

পেতে চাই, 'হারা' হ'তে চাই। কোথায় হতে ভেসে এসেছিলাম, কোথায় যেন আট্‌কে গেছি, আজ আবার আমি সেথায় ছুটে যেতে চাই। আমার সেই গতি ফিরে পেতে চাই। তাই ওগো, তুমি যেই হও, আমায় আর জড়াইও না। রূপ হ'ও মোহ হও, প্রেম হও, মায়া হও, আজ সব দূরে চলে যাও। ঐ শুন, বিরাম-বিহীন অনন্ত কলরোল, ঐ খানে সৃষ্টি ও প্রলয়ের লীলা। আবার ঐ দেখ দূরে অস্পষ্ট কোন শব্দ নাই, দেখা যায় না—শূন্য,—মহাশূন্য শুধু——কোথায় সৃষ্টি কোথায় প্রলয়? কিছুই নাই। ঐখানে আমার সব, ঐখানে আমি ফিরে যেতে চাই। ছুটে; প্রকৃতি ছুটুক; নাচিয়া খেলিয়া আবার সে আপনিই বসিয়া পড়িবে। কিন্তু আজ পুরুষ একবার আপন মহিমায় দাঁড়াইতে চায়। তাকি অসম্ভব? তবে কেন চিত্ত আমার আজ এমন সবলে ফিরে দাঁড়িয়েছে? কেন সমস্ত প্রকৃতির দিকে এমন সে বিদ্রোহী হয়েছে? সারাটা হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গিয়ে কেন সেখান হ'তে শুধু একটি বাণী ধ্বনিত হইতেছে—মুক্তি চাই, ওগো আমি মুক্তি চাই।

হে আষাঢ়ের নবঘন-শ্যামকান্তি, হে অতীতের কত মনোরম শতস্মৃতি,—হৃদয়ের স্তরে স্তরে কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিলে; দিয়াছি, সমস্ত দিয়াছি—কিছু বাকী রাখি নাই। আজ ঐ আকাশে আমার ভাগ্য লিপি বজ্রানলে রেখা টানিয়া গিয়াছে—তবে ঘরের বাহির হইতে এখন আর আমার কিসের দেরী, কিসের ভয়?

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

বর্ষাগমে।

১

নিদাঘ তপন, সখি, আরত জ্বলে না কই—
বয় স্নিগ্ধ বায়।
শুভ্র জলদের ধারা সুনীল আকাশে, ওই
ভাসিয়ে বেড়ায়।

২

শ্যামল প্রান্তর পাশে ফুটেছে তুষার-মন্ন
কদম্বের ফুল।
ফুলে ফুলে ভন্ ভন্ গায় গীত মধু আশে
মত্ত ভৃঙ্গকুল।

৩

আবার কি মেঘরাশি তেমনি ঢাকিবে, সই
(থর্ থর্) কাঁপায়ে মেদিনী,
বঁধু কর-স্পর্শে যেন কাঁপিল বদন, ভাবি
(যে রবে) চকিত বিরহিণী।

৪

এই না বরিষা কালে চপলা চমক হেরি
মনে পড়ে মুখ,
মেঘের গরজে কাঁপে অস্থিরা মেদিনী, সই
(থর্ থর্) কেঁপে উঠে বুক।

আবার কি ভেক দল গাইয়ে উঠিবে, সই
বিরহের গান,
আবার কি নব নদী রোধিয়ে বঁধুর পথ—
বহিবে তুফান।

৬

বজ্র উৎপীড়নে, সই আবার কি মেঘমালা
কাদিবে তেমনি,
ঝম্ ঝম্ অশ্রুবারি অনুদিন বরিষণে
ভাসাবে মেদিনী।

৭

এই না দারুণ কাল ঘোর অন্ধকার ছায়
আন্ধার রজনী,
যে আন্ধার বক্ষে লেখা প্রিয়' বিবর্জ্জিত, হেরে
(অতীতের) অপূর্ব্ব কাহিনী।

৮

এই না বরিষা কালে সর্ব্বসি দুকূল ভরা
তরঙ্গ উঠাবে।
এই না শীতল বায় সিঞ্চিয়ে সোহাগ ভরে
কুমুদ ফুটাবে।

স্নাত বরিষার জলে উজ্জল কুমুদ-সখা
হাসি হাসি মুখে,
আকাশে ভাসিয়ে রবে, কুমুদী কান্তার পানে
চেয়ে রবে সুখে।

১০

ভাল, ভালবাসা কাল আমি করেছিনু, সই
চন্দ্র কর (ও) ভারী,
বরিষা পীড়ন দায় চন্দ্রের কটাক্ষ গায়
বুঝি প্রাণে মরি।

১১

কোন্ দূরদেশে, সখি বরিষা ঝরে না তথা
নাহি ঋতু ভেদ,
কোথা কোন্ প্রেমে, সখি কান্দেনা বিরহীজনে
জানে না বিচ্ছেদ।

১২

সেই দূরদেশে, সখি কে আমারে লয়ে যাবে
সাগরের পার,
দারুণ এ কালে বুঝি, অঞ্চলে যৌবন বয়ে
বাচিব না আর।

৺ মহম্মদ আজীজ উস্ সোভান।
সিউড়ী।

পানে পোকা।

১

"নীহার"

"কি মা"

"পান সাজা এখনও হয় নি? দেনা একটা।"

'যাই মা' বলিয়া একটি কিশোরী রমণী কয়েকটি পান একটি ডিবায় লইয়া আসিয়া মাতার হস্তে দিল। মাতা দুইটি পান একসঙ্গে মুখে পুরিয়া, সম্মুখস্থ দোক্তার কৌটা হইতে একটু দোক্তা লইয়া মুখে দিলেন। "পোড়া অভ্যাসের মুখে আগুণ, ভাত না হলে দুদিন বাঁচ্‌বো, তো পান না হ'লে এক দণ্ড বাঁচিনে। কি কুক্ষণেই যে এ ছাই দোক্তা খাওয়া শিখেছিলুম, তোরা বাছা আজও খেতে শিখিস্ নি, আর যেন কোনো কালে শিখিস্‌ও না।"

নীহার মাতার আক্ষেপোক্তি শ্রবণে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "মা, তুমি যেমন

আমাকে আর দিদিকে মানা কর, তোমার মা কেন তোমায় তেমনি দোক্তা খেতে মানা করেনি ?"

মাতা কহিলেন "আমার মা, সেকালের লোক ছিলেন বাছা, তাঁরা তো পানে দোক্তা খাওয়া, আর দাঁতে মিশি দেওয়া সব মেয়েরই করা উচিত জান্‌তেন।"

"নীহার, তোর ঠোঁট দুখানা যেন বড্ড সাদা লাগ্‌ছে, যা একটা পান খেয়ে আয়।"

নীহার আবার পান সাজিয়া খাইতে গেল, ইতিমধ্যে মলিনা আসিয়া মায়ের নিকট বসিয়া বলিল, "মা, আমার তো আর থাকা হয় না, এই দেখ, খাশুড়ি আবার লিখিছেন, যে আমার ননদ শশুর বাড়ী যাবে, কাজেই তার আগে আমার যাওয়া চাই-ই, কি করি মা ?"

মাতা ম্লান মুখে কহিলেন, "কি বল্‌ব মা ? দু'মাস হলো, তুমি এসেছ, ভেবেছিলুম, এর ভেতর নীহারের বিয়েটা হয়ে যাবে, কিন্তু হবার তো কোনো যোগাড় দেখি না। মেয়ে সুন্দর না হলেও অমন সুশ্রী মেয়ে কমই দেখা যায়. বড় সাধ করে তিনি লেখা পড়াও বেশ শিখিয়েছিলেন, সংসারের সকল রকম কাজ কর্ম্ম, আবার সেলাই, বোনা সবই বাছা শিখেছে, কিন্তু ওর অদৃষ্টে বুঝি সুপাত্র নেই, তিনি থাকৃলে কি আর এত ভাব্‌তে হতো ? তোমার বিয়ে দিয়ে ভেবেছিলুম, মনের মতন বড় জামাইটিতো হলো, এমনি ছোটটিও হবে, তা আমার পোড়া অদৃষ্ট মা।

এখন সবাই টাকাই বেশী চায়, বড় বাড়ী বাগান দেখে লোকে মনে করে কর্ত্তা অনেক টাকাই রেখে গেছেন। অই বীরভূম থেকে একটি পাত্র সেদিন দেখে গিয়ে মেয়ে খুব পছন্দ করে গেছে, তারা বিনা গহনা পয়সায় মেয়ে এখনই চাইছে, কিন্তু জামাইয়ের বয়েস প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি. দুটি বেশ সেয়ানা ছেলেও আছে, তা অগত্যা সেইখানেই বিয়ে দোব, মেয়ের খাবার পর্‌বার তো কষ্ট হবে না।"

যুবতী মলিনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "না মা, তোমার পায়ে পড়ি, বুড়ো ভগ্নিপতি চাই না, আর দুদিন সবুর কর মা, বাপের বয়সী বরের সঙ্গে নীহার মুখ তুলে কথা কইতেও পার্‌বে না ?"

সহসা একটি করুণ আর্ত্তনাদে উভয়েই চমকিয়া উঠিয়া ছুটিয়া গেলেন, গৃহ-মধ্যে গিয়া দেখিলেন নীহার ধূলায় লুটাইতেছে, মুখে অল্প অল্প ফেনা উঠিতেছে, চক্ষুদ্বয় স্তিমিত। মাতা চীৎকার করিয়া কহিলেন—

"ওরে মলিনা, একি সর্ব্বনাশ হলো রে। ওমা নীহার নীহার।"

নীহার লুপ্ত চেতনা! কোন উত্তর নাই।

মলিনা বলিয়া উঠিল," মা সবাই যে বলে পানে পোকা হয়েছে, এ নিশ্চয় তাই। আমি বাপু ঐ ভয়ে পান খাই না, তোমার তো পান না হলে একদণ্ড চলে না। ঐ দেখ, নীহারের মুখের মধ্যে আধ চিবুনো পান রয়েছে, নইলে শুধু শুধু অমন সুস্থ সবল মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়্লো কেন? তুমি নীহারকে দেখ মা, আমি ডাক্তার বাবুকে ডাক্তে পাঠাই, হায়, হায় বিনয়ও ইস্কুল গেছে, ঝিও নেই, কেই বা ডাক্তে যাবে।"

ক্ষিপ্র পদে মলিনা আসিয়া বহির্দ্বারে দাঁড়াইল, ভাগ্যক্রমে এক ব্যক্তি পথ দিয়া যাইতেছিল, মলিনা তাড়াতাড়ি কহিল,

"রামলাল, রজনী ডাক্তারকে শীগ্‌গির গিয়ে আমাদের নাম করে ডেকে আন, বল'গে যে নীহার অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

দয়ালু রামলাল ত্বরিতগতিতে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল, এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক সমভিব্যাহারে ফিরিয়াও আসিল।

কিন্তু মলিনা এ ডাক্তারটিকে দেখিয়া একেবারে অপ্রস্তুত ও চমকিত হইয়া উঠিল, ঘোমটা দিয়া পলাইবে কিনা তাহাও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, কেন না চিরপরিচিত, পিতৃ-বন্ধু শুক্লকেশ রজনী বাবুর পরিবর্ত্তে, এই সম্পূর্ণ অপরিচিত, সুশ্রী, দীর্ঘাকৃতি যুবককে সে প্রত্যাশা করে নাই। রামলাল মলিনার ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া কহিল, "বড় দিদি, ডাক্তার বাবু বাড়ী নাই, ইনি ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানায় বসেছিলেন, এঁকে সব বল্‌তে ইনি বল্‌লেন, আমি ভাল করবো।"

ইতিমধ্যে আগন্তুক কথা কহিল,

"বিলম্ব করবেন না, রোগী কই?

আজ কাল বহরমপুরে প্রায়ই এইরূপ হঠাৎ মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, সম্ভবতঃ পানে পোকা হয়েছে বলে যে রাষ্ট্র হয়েছে, তাই হতে পারে, রজনী বাবুর ছাত্র বলেই আমাকে জানবেন।"

মলিনা যুবককে লইয়া যে গৃহে রোরুদ্যমানা জননী মূর্চ্ছিতা কন্যার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন, সে গৃহে প্রবেশ করিল। যুবক ব্যগ্রভাবে নীহারের সেবায় নিযুক্ত হইল, মলিনাকে কহিল "আপনি শীঘ্র একটি শয্যা প্রস্তুত করুন,আপনারা চিন্তা করবেন না, কোনো ভয়ের কারণ নেই শীঘ্রই ইনি

সুস্থ হবেন, আমি কালই এই প্রকারের দুটি রোগী দেখেছি, আজ তারা সুস্থ আছে।”

ডাক্তারের আদেশমত শয্যা প্রস্তুত হইল, এবং রোগিণীকে শয়ন করাইয়া ঔষধের ব্যবস্থার জন্য ডাক্তার গৃহ-গমন আবশ্যক বোধ করিলেন, এবং কহিলেন—“আপনারা নির্ভয়ে থাকুন, যে ওষুধ এখন আমি দিলাম, এতেই উপকার হবে, আমি আবার আসছি।”

মাতা সাশ্রুনয়নে, কহিলেন “বাবা, তুমি দীর্ঘজীবী হও, আমার বাছার প্রাণদান দাও। আমি দুঃখিনী বিধবা, এই মেয়ে দুটিই আর একটি নাবাল এ সন্তানই আমার সন্তান।”

যুবক নত মস্তকে বাহিরে আসিল, মলিনা দুইটি টাকা লইয়া যুবকের হস্তে দিতে গেল। (রজনী বাবু এ বাড়ীতে কখনও ভিজিট লইতেন না, কিন্তু মলিনা জানিত, চিকিৎসক দর্শনী না পাইলে চিকিৎসাও মনোযোগের সহিত করেন না, বিশেষ এই অপরিচিত নবাগত ডাক্তারকে তাঁহার প্রথম দর্শনী না দেওয়াটা ভদ্রোচিত হইবে না ;) যুবক মলিনার মুখের প্রতি চাহিল, তাহার কর্ণে তখনও সেই করুণ অনুনয় বাণী বাজিতেছিল, “আমি দুখিনী বিধবা” সুতরাং অর্থ লওয়াটা সঙ্গত কিনা এই প্রশ্ন চকিতে তাহার মনের মধ্যে উদয় হইল, ইতিমধ্যে মলিনার হস্ত এত নিকটে আসিল, যে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় চিকিৎসক টাকা দুটি লইয়া ত্বরিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন, দ্বিতীয়বার মলিনার বিশুষ্ক মুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখিতে সাহস হইল না।

বেলা অবসান হইতে তখন ও কিছু বিলম্ব আছে, বর্ষাকালের দুর্লভ রৌদ্র সমস্ত পৃথিবীকে রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে ; সূর্য্যদেবের সদ্যস্নাত তরুণকান্তি, সুন্দর শিশুর অশ্রুপ্লাবিত আননে মধুর হাস্যচ্ছটার ন্যায় সকলকে আনন্দিত করিতেছে, ধূম্রবর্ণ মেঘপুঞ্জ, স্বর্ণ কিরণে মণ্ডিত হইয়া, অপরূপ শোভায়, ক্ষিপ্র-গতিতে আকাশের গায় ছুটাছুটি করিতেছে।

অতি শুভ্রকান্তি বলাকার শ্রেণী সারি বাঁধিয়া আকাশের কোলে উড়িয়া উড়িয়া তাহাদের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছে, কোন কোন গাছ আবার সেই বালাকার দলে ভরিয়া গিয়াছে, ঘনশ্যাম পল্লবপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে সেই বলাকা-গণের সন্নিবেশ দূর হইতে শুভ্র পুষ্পের ন্যায়, কি মনোহর দৃশ্য !

তখন নীহারের জ্ঞান হইয়াছিল। উন্মুক্ত বাতায়ন সম্মুখে তক্তাপোষের উপরে নীহারকে শয়ন করাইয়া ব্যজন করিতে করিতে উৎসুক হৃদয়ে ডাক্তারের আগমন প্রত্যাশা করিতেছিল, যদিও নীহারকে দেখিয়া বেশ বোধ হইতেছিল, সে শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবে, তথাপি চিকিৎসকের পুনরাগমন যে অত্যাবশ্যক ইহা মলিনা ভুলিতে পারিতেছিল না, একটিবার চকিতের মত অপরিচিত চিকিৎসক দেখা দিয়াও কে জানে মলিনার হৃদয়ের কোন্ তারে যে ঘা দিয়াছিল, তাহার সুর মলিনা বুঝিতে পারিল না।

মাতা তখন বৈকালিক রন্ধনের উদ্যোগে গিয়াছিলেন। এমন সময়ে বিনয় কমলকে কোলে লইয়া এবং এক হাতে ঔষধের শিশি লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

মলিনা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল,

"কই রে, ডাক্তার কই? তিনি বুঝি এলেন না?" বিনয় কহিল, "একটু পরেই আস্‌ছেন, এই ওষুধ এক দাগ এখনই খাওয়াতে বল্‌লেন। তুমি খোকাকে নাও দিদি, আমি ওষুধ ঢাল্‌ছি, যে তোমার দুষ্ট ছেলে, সারাটা রাস্তা হাত থেকে ওষুধের শিশি নেবার জন্যে যে কাণ্ড করেছে।"

আজ সারাদিন ব্যস্ততা প্রযুক্ত মলিনা খোকাকে কোলে লইবার অবকাশ পায় নাই, সুতরাং "এস বাবা" বলিয়া দুই হাত বাড়াইয়া খোকাকে লইতে গেলেন, কমলও আজ সারাদিন মাতার বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া মলিন হইয়াছিল, বিশেষ মাসীমা তাহার সারাদিনকার ক্রীড়ার সাথী সেই মাসীমাকে আজ আর দেখিতে পায় নাই, এক্ষণে সহসা মাতার সস্নেহ আহ্বানে চকিতে সে শিশু-হৃদয় চাঞ্চল্যপূর্ণ হইয়া উঠিল, মৃদু মধুর হাসিতে সে পুষ্পতুলা ঠোঁট দুখানি ভরিয়া গেল, ঝাঁপাইয়া জননীর ক্রোড়ে গিয়া আনন্দে স্তন্যপান আরম্ভ করিল।

মলিনা বার বার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সেই কচিমুখ খানি চুম্বন করিতে লাগিল।

নীহার নীরবে মাতাপুত্রের এই আনন্দালাপ দেখিয়া দেখিয়া কহিল—

"দিদি, খোকাকে আমি একটা চুমো খাই" মলিনা কহিল, "না বোন্, ও বড় দুষ্টু, তোকে জ্বালাতন করবে, তুই সাম্‌লাতে পার্‌বি না। ইতিমধ্যে বহিঃপ্রাঙ্গনে জুতার মস্ মস্ শব্দ শুনা গেল, কে ডাকিল "বিনয়, কোথায় হে"

"আসুন ডাক্তার বাবু" বলিয়া দ্রুতপদ বিক্ষেপে বিনয় তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া ডাক্তারের হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিল।

নলিনা ত্রস্তভাবে গা মাথার কাপড় সাম্‌লাইয়া লইয়া বসিল, নীহার পার্শ্ব ফিরিয়া ছিল, চাহিয়াও দেখিল না।

ডাক্তার শয্যার এক প্রান্তে বসিলেন, ওদিকে কমল স্তন্য পানে বাধা প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিল, তখন আর মাতার ক্রোড়ে বৃথা অলসের ন্যায় অবস্থান যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিল না, সে তাহার অমূল্য সময় এক মূহূর্ত্তও বৃথা অপব্যয় করিতে কোন মতে রাজী নহে, টলিতে টলিতে ডাক্তারের দিকে অগ্রসর হইল, কেন না, ডাক্তার বাবুর স্বর্ণ-চেন-বিলম্বিত ঘড়িটি তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, ডাক্তার বাবুও বলিয়া উঠিলেন, "ওহো কমল বাবু যে, পুরাতন বন্ধু, এস এস" সে কমলকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে লাগিল। এবং কমলও সে আদরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সাধ্যমত পকেট হইতে ঘড়িটি টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিল, শীঘ্রই ঘড়িটি শিশুর করায়ত্ত হইল, উহার টিক্ টিক্ শব্দে কখন অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়া একবার মাতার মুখের দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। নলিনা কহিল "লক্ষ্মী ধন, রেখে দাও, এখুনি তুমি ভেঙ্গে ফেল্‌বে" কমল কাহারও কথায় গ্রাহ্য না করিয়া, উক্ত গোলাকার কাচ মণ্ডিত পদার্থটির আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করিল, ক্ষুদ্র রক্তিমাভ জিহ্বাটি বাহির করিয়া কয়েকবার লেহন করিল, বুঝি বা তখন খোকা বাবুর মস্তিষ্কে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদয় হইয়াছিল, যদি ভবিষ্যতে ঘড়ি চাটিয়া এই ক্ষুধার্ত্ত বঙ্গবাসীর উদর জ্বালা কিছু প্রশমিত হইতে পারে।

(কমল না ভাবিলেও এটা সত্য। আহার্য্যসামগ্রীর অপেক্ষা ঘড়ি জিনিষটার আমদানী এদেশে খুবই বাড়িয়াছে, এবং কাট্‌তির দরুণ দিন দিন সুলভও হইতেছে।)

বিনয় বেগতিক দেখিয়া ঘড়িটি কাড়িয়া লইল, এবং কমলের আপত্তি সূচক চীৎকারের পূর্ব্বেই গোটাকতক লজঞ্জুশ তাহার হাতে দিল।

চিকিৎসক প্রিয়দর্শন শিশুটির ক্রীড়ায় প্রীত হইয়া হাসিতেছিল, এমন সময়ে বিনয় কহিল "রমেন্দ্র বাবু, দিদিকে দেখুন একবার, ওষুধটা এক দাগ খাওয়ালুম।"

"হাঁ" বলিয়া রমেন্দ্র রোগিনীর দিকে ফিরিল, এদিকে নীহারও অপরিচিত রমেন্দ্র নাম শুনিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু একি বিভ্রাট, সেই একটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই দুটি তরুণ হৃদয় অলক্ষ্যে বিলোড়িত হইয়া উঠিল, উভয়ের অজ্ঞাতে উভয়ের দুটি প্রাণ যেন পরস্পরকে স্বাগত সম্ভাষণ করিল।

রমেন্দ্র দেখিল, বৈকালীন মেঘভাঙ্গা আনন্দজনক রৌদ্রকিরণে ঈষৎ ম্লান পাণ্ডুর মুখখানি, কাল তারা বিশিষ্ট দুখানি ঘন-পল্লব চক্ষুর উজ্জ্বল চাহনি। ফুটন্ত গোলাপের পাপ্‌ড়ার তুল্য মনোহর ওষ্ঠাধর দুটি ঈষৎ শুষ্ক।

বুঝি বা সে ম্লান মুখ কান্তি চিরতরে যুবার মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া গেল। আর কিশোরী নীহার দেখিল, উন্নতকায়, সৌম্যদর্শন অপরিচিত যুবার দীপ্তি-পূর্ণ চক্ষের সাগ্রহ দৃষ্টি, বালিকা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

রমেন্দ্র আবশ্যকীয় প্রশ্নাদি করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা পূর্ব্বক বিদায় লইলেন, চতুরা নলিনা সকলই লক্ষ্য করিয়াছিল। যখন প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া রমেন্দ্র বিদায় লইল, তখন কৌশলে রমেন্দ্রের পূরা নাম রমেন্দ্রকুমার মিত্র জানিয়া লইয়া পরদিন প্রাতে পুনরায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে ভুলিল না, আর এদিকে নীহার নূতন চিকিৎসকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া স্বায় কৌতূহল নিবারণ করিবার ইচ্ছা করিলেও তাহার একটিও কথা সে সম্বন্ধে ফুটিল না।

৩

শীঘ্রই দু'এক দিনের মধ্যেই নীহার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেও এবং চিকিৎসকের কিছু মাত্র আবশ্যক না থাকিলেও যুবক চিকিৎসকটির আসিবার মাত্রা বৃদ্ধি বই হ্রাস প্রাপ্ত হইল না। ক্রমে ক্রমে যেন রমেন্দ্র আত্মীয়ের ন্যায় হইয়া উঠিল। মাতা রমেন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, নিমন্ত্রণ করিয়া আহা-রাদি করান, এবং রমেন্দ্রও কোন দিন দ্বিরুক্তি না করিয়া নির্লজ্জ ঔদরিকের ন্যায় তৃপ্তির সহিত ভোজন কার্য্য সমাধা করেন।

নলিনার লজ্জার বাধ ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং শীঘ্রই অসঙ্কোচে সে রমে-ন্দ্রের সহিত আলাপ জমাইয়া লইল, বিনয় এবং কমলতো পূর্ব্ব হইতেই রজনী বাবুর বাড়ী যাতায়াতসূত্রে রমেন্দ্রের সহিত পরিচিত ছিল, এক্ষণে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতাতে পরিণত হইল, তাহার ফলে বিনয়ের নানা প্রকার প্রশ্নজালের সমস্যা নির্দ্ধারণে বেচারা রমেন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে বিশেষ বেগ পাইতে হইত, আর কমলের দৌরাত্ম্য ও যে কম সহ্য করিতে হইত তাহা নয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নীহারের সহিত রমেন্দ্রের বিন্দুমাত্রও আলাপ পরিচয় হইল না, তাহার সরম সঙ্কোচ দিন দিন যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

একদিন অপরাহ্নে দুই ভগ্নীতে বসিয়া রহস্যালাপ করিতেছে, সহসা রমেন্দ্রের সুপরিচিত পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া (এত শীঘ্রই কিশোরী নীহারের নিকট উহা যেন বহুদিনকার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।)

নীহার ত্রস্ত ব্যাধভীতা হরিণীর ন্যায় সেস্থান ত্যাগ করিল, এবং ব্যাধরূপী রমেন্দ্রের তীক্ষ্ণ লোলুপ কটাক্ষবাণ, লক্ষ্যভূত মৃগীর অনুসরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইল না।

রমেন্দ্র হাস্যমুখে একখানি টুল টানিয়া লইয়া মলিনার কাছে বসিল, দুই একটা কথাবার্ত্তার পর পরিহাসচ্ছলে মলিনা কহিল "রমেন বাবু, আপনি তো ডাক্তারী পাস করেছেন, বল্‌তে পারেন, পানে তো পোকা হয় প্রাণেও কি পোকা ধরে না?"

রমেন্দ্রের গণ্ডস্থল ও কর্ণমূল ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্ম-সম্বরণ করিয়া কহিল.

"কথাটা নূতন ঠেক্‌ছে, ভেঙ্গে বলুন, কি বৃত্তান্ত, কারই বা পোকা ধরেছে"

"পানে পোকা হয়, একথটাও কি খুব নূতন নয়? আপনারা চিকিৎসক লোক, রোগ নূতন হলেও, চিকিৎসারও নূতন প্রণালী বের করতে হবে, হাল ছাড়্‌লে চল্‌বে না"

রমেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল,

"হাল ছাড়্‌বো কেন? রোগ শুধু মুখে বল্‌লে হয় না, রোগী দেখান, পরীক্ষা করে' দেখ্‌লে আর চিকিৎসার ক্রুটি হবে না, রোগ তো হাজার রকম আছেই"

দুষ্ট মলিনা আর একবার বলিল না, কারও হয় নি, অমনি জিজ্ঞেস কর্‌ছি-লমে, কিন্তু ডাক্তারদের নিজের যখন অসুখ হয়, তখন তারা বড় একটা রোগ ধর্‌তে পারে না—নয় কি?"

রমেন্দ্র হাসিয়া বলিল "তা বটে"

কথা প্রসঙ্গে মলিনা বলিল—

"আপনি যে শীগ্‌গিরই বাড়ী যাবেন বল্‌ছিলেন, তা আর দিন কতক থেকে গেলে হয় না কি?" রমেন্দ্র হাসিয়া কহিল "কেন? আরও দু এক দিন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ান হবে না কি? আপনার হাতে মাংস রান্না খেতে বড় সুস্বাদ" মলিনা কহিল, "মাংস আমি খাইও না; কাজেই রাঁধ্‌তেও জানি না, নীহারই মাংস রাঁধে ও নীহার এদিকে আয় তোর যে রান্নার প্রশংসা হচ্ছে।"

রমেন্দ্র একটু অপ্রস্তুত হইল, মলিনা তাহা বুঝিয়া হাসিল, এবং কহিল,—

"হ্যাঁ সত্যই আবার আপনাকে নিমন্ত্রণ খেতে হচ্ছে, শুভ উৎসবের নিমন্ত্রণ।"

রমেন্দ্রের বিস্তৃত ললাটে যেন কাল ছায়া পড়িল, সরস হাস্য ও প্রফুল্ল ভাব

ঈষৎ মলিন হইল, বুকের ভিতরটা ও যেন দুর্ দুর্ করিয়া না কাঁপিল তাহা নয়, মুহূর্ত্তের এই পরিবর্ত্তন মলিনার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে অতিক্রম করিল না। কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া আগ্রহ দেখাইয়া রমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,

"বটে, কিসের শুভ উৎসব? এখন থেকেই হজমীগুলি খেয়ে ক্ষুধা শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকব নাকি?"

মলিনা কহিল "নীহারের বিবাহ; নিকটবর্ত্তী এক জায়গায় নীহারের ফটো পাঠান হয়েছিল, বর নিজে পছন্দ করেছে আর নিজেরও একখানি ফটো পাঠিয়ে দিয়েছে, আপনি দেখ্‌বেন?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মলিনা গৃহমধ্য হইতে আল্‌ব্যাম লইয়া আসিল, বরের ফটোখানির সহিত আল্‌ব্যামস্থিত নীহারের ফটোখানি মিলাইয়া মলিনা কহিল, "রমেন বাবু বেশ মিল্‌বে না?"

রমেন্দ্র অন্যমনস্ক হইয়াছিল, তাহার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর অকারণ জড়তাপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং কিছুই উত্তর দিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে কমলের আকস্মিক চীৎকারে আল্‌ব্যাম্ ফেলিয়া দ্রুতপদে মলিনা চলিয়া গেল, এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, নীহারের আল্‌ব্যামস্থিত ফটোখানি হস্তগত করিয়া তরুর চিকিৎসক পলায়ন করিয়াছে, বিদায় সম্ভাষণের অপেক্ষাও করে নাই।

৪

মলিনা কহিল, "মা রমেন বাবুর সঙ্গে নীহারের বিয়ে দিলে হয় না? যার সঙ্গে নীহারের বিয়ের কথা হয়েছে, তার চেয়ে আমার রমেনকেই ভাল বোধ হয়।"

মা কহিলেন "সে তো বটেই, সে হচ্ছে অদেশ অজানা, এ ছেলেটিকে চোখে দেখেছি আমার পোড়াকপালে কি নীহার অমন বর পাবে মা?"

কন্যা গর্ব্বিতা, জননী পরক্ষণে আবার কহিলেন, "তা নীহারের মতন স্ত্রী ও সকলের হবে না, অমন শান্ত, অমন ধীর শ্রীও বেশ আছে, সব গুণেই আমার বাছা পরিপূর্ণ।"

"কিন্তু মা, ওঁর বিয়ে হয়েছে কি না কিছু জানি না, খুব সম্ভব হয় নি, আমার জিগ্‌গেস করতে সাহস হয় না, কি জানি যদি বলে বসে, 'হয়েছে। আমার প্রথম হতেই রমেনকে ভাল লেগেছে, আর নীহারের সঙ্গে যাতে বিয়ে হয়, সেই ভেবে আস্‌ছি।"

সেদিন রমেন্দ্র আসিলে, মলিনা কহিল,

"মা রমেন বাবু বাড়ী যাবেন, ওঁর ছেলের অসুখ করেছে বুঝি?"

রমেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া কহিল ;

"সেকি কথা ? কে বল্লে ? আমারতো সন্তানাদি নাই ?"

মলিনা কহিল "বটে ? তবে যে বিনয় বল্‌ছিল, এটা তা হ'লে মিথ্যে।"

রমেন্দ্র জোরের সহিত কহিল 'নিশ্চয়ই'

মাতা কহিলেন, 'বাবা, বাড়ী যাবে, আবার আসবে তো ? তোমার ওপর আমাদের একটা মায়া বসে গেছে, যেন ঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে।'

রমেন্দ্র ধীর স্বরে কহিল, "এখানে ডাক্তারী পাস করে বেড়াতে এসেছিলুম, রজনী বাবু এক রকম আমাদের আত্মীয় কি, না।

"এইবার বাড়ী গিয়ে প্র্যাক্‌টিসের স্থান ঠিক করে সেখানে বসে ব্যবসা নিজের চালাতে হবে তো মা, নইলে পেট চলবে কি করে ? মা ভাবছেন্, আমার ছোট ভাইটি কলকাতায় পড়ে, সেও লিখ্‌ছে "দাদা কবে আস্‌বে" বাবা নাই, আমারই উপর সংসারের ভার, আর যে আস্‌তে পার্‌বো, তা বোধ হয় না, তবে আপনারা যেরূপ স্নেহ যত্নে আমায় বশীভূত করেছেন, বিশেষ কমলকুমার, তাতে মাঝে মাঝে না এসে থাক্‌তে পার্‌বো না,"

মাতা, রমেন্দ্রের মাতাকে সমদুঃখিনী জানিয়া পিতৃহীন রমেন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে মলিনা কহিল, "ডাক্তার বাবু, যদি কখনও আবার দয়া করে আসেন, আপনার স্ত্রীকেও আন্‌বেন, তা হলে আমরা বড় সুখী হবো।

রমেন্দ্র অধোমুখে কহিল, "আমি অবিবাহিত"

মাতা কহিলেন, "তবে বুঝি বিয়ে কর্‌তেই যাচ্ছ বাবা ? তা বেশ, লক্ষ্মীর মত বউ হক, সুখী হও, তোমার বিধবা মা, বউ নিয়ে আহ্লাদ করুন। তুমি আমার নীহারকে বাঁচিয়ে জন্মের মত আমায় কিনে রেখেছ"

রমেন্দ্র নিরুত্তর, মাতা কার্য্যান্তরে গেলেন, এমন সময়ে, "দিদি, দিদি" বলিতে বলিতে ব্যস্ত ভাবে নীহার সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আলুলায়িত-কুন্তলা, শিথিলবেশা বালিকা জানিত না যে রমেন্দ্র সেথায় উপস্থিত আছে, মুহূর্ত্তে তাহার গণ্ড দুটী আরক্ত হইয়া উঠিল। ব্রীড়াবনতমুখীকে পলায়নোদ্যতা দেখিয়া মলিনা তাহার অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যাস কেন ? কি হয়েছে ? রমেন বাবুকে তোর অতো লজ্জা কিসে ? উনি তোকে আরাম করেছেন, উনি বাড়ী যাচ্ছেন, ওঁরে দুটো ধন্যবাদের কথাও কি বল্‌বি না ?"

এ তীব্রতার অনুযোগ নীহারের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিল। রমেন যাইতেছে; কেন? যাইবার কি আবশ্যক? অথবা সে কেনই বা নিজের বাড়ী না যাইবে? তাহার যাওয়ায় বা থাকায় নীহারের লাভই বা কি? ক্ষতিই বা কি?

জীবন রক্ষার জন্য উহাকে ধন্যবাদ দিতে হইবে? সত্য, কিন্তু কি বলিয়া দিবে? ভাষায় এমন কি কথা আছে, যাহার দ্বারা সলজ্জা কিশোরীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইতে পারে?

এদিকে নীহারের আগমনে, রমেন্দ্র যুগপৎ আনন্দিত ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, সে যে কি করিবে. অপ্রস্তুত নীহারের লজ্জার কারণ স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান রহিবে অথবা প্রস্থান করিবে, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না, ইতিমধ্যে সহসা বিনয়কুমার আসিয়া সকলকে সংশয় ও দ্বিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করিল।

বিনয় তাড়াতাড়ি কহিল, "ছোট দি, বড় দিকে বলেছ? বড় দি, রামিয়ার বাপের কলেরা হয়েছে।

"বড় বিপদ বেচারীর টাকা নেই, যে ডাক্তার আনে ওষুধ দেয়, আমরা এখন না দেখলে আর উপায় নেই, রামিয়া কত কাঁদছে আমার দুটো পা ধরে বললে "দাদাবাবু দিদিদের গিয়ে বল, আমার বাবাকে তোমরা বাচাও, আমার সংসারে এই বাপ ছাড়া আর কেউ নাই।"

মলিনা বিস্মিত হইয়া কহিল, "[illegible] কিরে, আজ সকালে যে তাকে সুস্থ দেখেছি. কাঠের বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল? রমেন বাবু ব্যারাম বড় খারাপ, কিন্তু আপনারা ডাক্তার আপনি না গেলে উপায় কি?"

রমেন নীহারের প্রতি চাহিল, দেখিল, বালিকার বৃহৎ কৃষ্ণ-তার চক্ষু দুটি করুণায় ছল ছল করিয়া রমেন্দ্রের প্রতিই স্থাপিত আছে, সে দৃষ্টিতে কতটা উদ্বেগ, কতটা চাঞ্চল্য মিশ্রিত, এবং তাহা নীরব অনুনয় বাণীতে পরিপূর্ণ।

রমেন্দ্র সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, মলিনার প্রতি চাহিয়া বলিল, "হাঁ নিশ্চয়ই আমি যাব, কিন্তু" —

মলিনা বাধা দিয়া কহিল, "ভিজিটের জন্য ভাব্‌বেন না, আমি দোব।"

মলিনার বাক্য রূপ তীব্র কশাঘাতে রমেন্দ্র মর্ম্মে মরিয়া গেল, সে দিন যে মলিনার নিকট হইতে সে ভিজিট লইয়াছিল, তাহা সে স্বেচ্ছায় নেয় নাই। রনী বাবু যে বাড়ীতে নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন, সে স্থানে

আসিয়া দর্শনী লইয়া পর্য্যন্ত অনুতাপ এবং লজ্জা ঠিক যেন কাঁটার মতন তাহার হৃদয়ে বিঁধিয়া আছে, কিন্তু অপরে তাহা কি বুঝিবে? চোখ মুখ রাঙ্গা করিয়া ঘর্ম্মাক্ত ললাটে যুবক কহিল—

"আমি ভিজিট চাই নি, এতটা হৃদয়-হীন ভাববেন না, আমি বলছিলাম, কলেরা রোগীর সেবা করা বড় কঠিন কার্য্য, খুব পরিচ্ছন্নতা ও সাবধানতার দরকার, ওরা নীচজাতি, সে সব বুঝে না।"

নীহার এবারে মৃদুস্বরে কহিল, "দিদি আমরা সেবা করবো, তাতে ক্ষতি কি?"

রমেন্দ্র শুনিতে পাইয়াছিল, বলিল "না, না, ও ছোঁয়াচে রোগের কাছে কারু যাওয়া উচিত নয়" আবার রমেন্দ্র নীহারের প্রতি চাহিল, এবারে নীহারের দৃষ্টি ক্রোধ ও ভৎসনা পূর্ণ, উহা যেন বলিতে চায়, অসময়ে, পীড়ার সময়ে মানুষকে কি পরিত্যাগ করা উচিত? যদি সে আমাদের আপনার লোকই হতো? এসো কিসে জীবনের ভয়? মৃত্যুতো একদিন আছেই, রমেন্দ্র সে দৃষ্টির তীব্রতা সহিতে পারিল না, চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

মলিনা উভয় পক্ষের দৃষ্টি বিনিময় দর্শন করিয়াছিল, সে কহিল, "রমেন্দ্র বাবু, রাগ করবেন না, শুনেছি, আর কতকটা দেখাও আছে, ডাক্তারেরা ভিজিটের লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারে না, হাত পাতা অভ্যাসটা তাঁহাদের শেষে এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে মুমূর্ষ পুত্রকে দেখে তখনি শোকাকুলা মায়ের কাছে টাকা চাইতে সঙ্কুচিত হন্ না, তবে সকলেই যে এক রকমের লোক তাও নয়, অনেকে খুব সৎ ও আছেন যাঁরা দান দুঃখীর পিতার মতন।"

"তা আপনি ভিজিট নাই নিলেন, আর সেবার কথা বল্‌ছেন্? সে যথাসাধ্য আমরাও কর্‌বো, আপনার চেয়ে আমাদের জীবন কিছু অধিক মূল্যবান নয়, আপনি যখন কলেরা রোগীর কাছে যেতে পাচ্ছেন, আমরা আর পারবো না?"

(৫)

সকালে ছাদের উপর বসিয়া মলিনা দুইখানি বৃহৎ থালে সরিষার তৈল মাখাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোস্ত বড়ি দিবার আয়োজন করিতেছিল, এবং সেই বড়িগুলি অতি ক্ষুদ্র হইলেও যেন নাসিকাবিহীন হইয়া স্বীয় নির্ম্মাণকারিণীর অপটুত্ব জগত সমক্ষে প্রচার করিয়া তাহাকে না অপদস্থ করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষরূপে মনের মধ্যে আন্দোলন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই বেশ সাবধান হইতেছিল।

বড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াই মলিনা আকাশের দিকে চাহিল, বর্ষার রৌদ্রকে কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, মাতার এ কথা বারবার শুনিয়াও সদর্পে মলিনা বড়ির আয়োজন করিয়াছিল, সুতরাং আজিকার দিনে সূর্য্যদেব যেন মুখ রাখেন, এই চিন্তা মলিনার হৃদয়ে খুব বলবৎ ছিল, ইতিমধ্যে শশব্যস্তে বিনয় আসিয়া একখানি পত্র মলিনার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "বড়দি, তোমার চিঠি নাও, এ চিঠি জামাই বাবুর নয়, এ রমেন বাবুর হাতের লেখা, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি; আমি এখন খেল্‌তে যাচ্ছি, ফিরে এসে শুন্‌বো, তিনি কি লিখেছেন। যাই হোক দিদি, বাড়ী গিয়ে তিনি আমাকে ভুলে যান নি, আমিও চিঠি লেখবার জন্যে তিন সত্যি করিয়ে নিয়েছিলুম, তা আমাকে না লিখে তোমায় লিখেছেন।"

চঞ্চল বালক, আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল, মলিনা বড়ি দেওয়া বন্ধ করিয়া, কৌতূহলের সহিত পত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিল—

নমস্কার নিবেদন!

দিদিমণি! দিদিমণি বলে প্রথম সম্ভাষণ এই কর্‌লাম, আর ভবিষ্যতে কর-বার আশাও রাখ্‌ছি, অবশ্য, যদি আপনি ভরসা দেন।

আমি বাড়ী এসেছি, কিন্তু আপনাদের জন্য মনটা বড় সময়ে সময়ে অস্থির হয়, এই অল্প দিনের মধ্যেই আপনারা অভাগার ক্ষুদ্র প্রাণটিকে হস্তগত করেছেন।

দিদি! আপনার মনে আছে, একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "প্রাণে পোকা হয় কি না?" তখন সে কথা বুঝ্‌তে পারি নি, কিন্তু এখন বুঝেছি, আমারই প্রাণে পোকা লেগেছে, এবং নিজে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হলেও সম্প্রতি নিজের দ্বারা নিজের চিকিৎসা হবেনা আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতীর হস্তে এ রোগের আরোগ্যের ভার রইল।

দিদি, জানেন্ তো, কঁচা বাঁশে ঘুন ধরলে তৎক্ষনাৎ যদি ইহার প্রতীকার না করা হয়, তাহা হইলে উহা অচিরে জীর্ণ হইয়া গুঁড়া হইয়া যায়, আমারও অবস্থা কি শেষে সেই প্রকার হবে। না দিদি, মিনতি করি, অতটা শোচ-নীয় অবস্থা ঘট্‌তে দেবেন না।

কেন না, ভবিষ্যৎ জীবনের একটি আনন্দ পূর্ণ চিত্র আমার নয়নের সমক্ষে নাচিয়া নাচিয়া আমার বাঁচিবার বাসনাকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। জগ-তের খুঁট নাটি সমুদয়ই আমার চক্ষে যেন অভিনব সৌন্দর্য্য পূর্ণ মনে হইতেছে।

আপনারা প্রত্যেকে কেমন আছেন জানিতে ইচ্ছা করি। কমল 'বাবুর সংবাদ কি? তার জন্য যে দু শিশি লজঞ্চুস ও একটি কাঠের ঘোড়া দিয়ে এসেছিলাম, তার জন্য সে কি একবারও আমার কথা মনে করে?

পত্রের উত্তরের আশা করিতে পারি কি?

কেন না, আমার গভীর স্বার্থ, আমার পীড়ার ঔষধ উহাতে নির্ভর করিতেছে।

মাতা ঠাকুরাণীকে আমার প্রনাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, তিনি আমায় সন্তানের স্থান দেবেন কি না?

বিনয়কে পত্র লিখ্‌তে পারলাম না, সেজন্য আমার হয়ে দুকথা তাকে মিষ্টি করে বলবেন। এখন আমি তবে দিদি—

আপনার
শুভাশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
'রমেন্'

পত্রখানি পড়িয়া বুদ্ধিমতী মলিনা সকলি বুঝিতে পারিল, এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইল। জননী তখন পূজায় নিযুক্ত জানিয়া সে শুভসংবাদ তখন আর তাঁহাকে শুনান হইল না। অতএব পুনরায় বড়ি দিতেই মনোনিবেশ করিল। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মলিনা বড়িগুলির নাসিকা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকিলেও এখন আর তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না, এবং নব-প্রসূত বড়ি শিশুগুলি খাঁদা ও বোঁচা হইয়া অভিমানে নতমুখ হইয়া রহিল। যখন মলিনা বড়ি দেওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন এক খানি পশমের জামা বুনিতে বুনিতে নীহার সেথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

নীহারকে দেখিয়া মলিনা জিজ্ঞাসা করিল,—

"খোকা ঘুমুচ্ছে তো?"

নীহার কহিল "হ্যাঁ দিদি, তাকে ঘুম পাড়িয়েই আস্‌ছি। তোমার সব বড়ি দেওয়া হয়ে গেল, আমি আজ একটুও দিতে পেলুম না"

মলিনা কহিল "আর এক দিন দিস্ এখন, আমি তো আর বেশী দিন থাক্‌ছি না"

ইত্যবসরে নীহারের দৃষ্টি, পত্রের উপরে পতিত হওয়ায়, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল।

"একি জামাই বাবুর চিঠি এলো? না, এতো তাঁর হাতের লেখা নয় দিদি!"

মলিনা অধোমুখে বড়ি দিতে দিতেই কহিল "ও চিঠি রমেন বাবু লিখেছেন"

"কি লিখেছেন," এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াই নীহার লজ্জিত হইল, কেমন করিয়া যে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার অবাধ্য জিহ্বা এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া ফেলিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

দুষ্ট মলিনা, মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল,

"রমেন বাবুর বিয়ে হবে, শুভ বিবাহে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। নিজে পাত্রী দেখে পছন্দ করে বিয়ে কচ্ছেন, যা হোক্, বিয়েতে যে আমাদের ভোলেন নি, এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

নীহার যে কি শুনিল. কিছুই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার সহাস্য মুখকান্তি তৎমুহূর্ত্তেই মলিন হইয়া গেল, অঙ্গুলীগুলি আর স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত রহিতে চাহিল না, এবং মলিনার উচ্চারিত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য একটু নির্জ্জনতার আবশ্যক হইল। ইতিমধ্যে মলিনার বড়ি দেওয়া শেষ হইল, সে শূন্য পাত্র লইয়া উঠিয়া পড়িল।

অধোবদনা নীহারের চিন্তা-ম্লান মুখখানি কটাক্ষে দেখিয়া এবং ফিক্ করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় নীহারকে ডাকিলও না, আর চিঠিখানা বোধ করি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফেলিয়া গেল।

নীহার সহসা এই নির্জ্জনতা পাইয়া একটু আশ্বস্তি বোধ করিল, এবং বোনা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল, "যদি সত্যই তাঁর বিবাহ উপস্থিত, সে সংবাদে আমার মন সুখী না হয়ে এমন খারাপ হয়ে গেল কেন? দিদি যেমন খুসী হয়েছেন, তেমনি খুসী তো আমারও হওয়া উচিৎ? তিনি আমাদের বন্ধু লোক, তাঁর বিয়েতে আমাদের সকলকারই খুব আহ্লাদ করা দরকার, মাও শুনে কত আনন্দ কর্‌বেন, আর আমার মনটাই শুধু এমনতর বিগ্‌ড়ে গেল কেন? ছি, ছি, আমার মন এতো নীচ হলো কেন? আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, কেন আমার বুকের ভিতর এমন ধড়ফড়ানি আরম্ভ হলো।

"ভাল, দেখিই না কি তিনি লিখেছেন। পত্র খানি হাতে লইয়া কিশোরী আবার ভাবিল, "না; চিঠি পড়ে আরও মন খারাপ হবে, তবে কি পড়বো না? আচ্ছা পড়েই দেখি, মন যা খারাপ হবার তাতো হয়েইছে, চিঠিতে হয়তো কনের বিষয় কিছু জান্‌তে পারবো" একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নীহার পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে নীহারের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, "দিদি কি মিথ্যাবাদী, উনি এসব কি লিখেছেন?"

অসহ্য পুলকভরে তরুণীর সমস্ত হৃদয় নাচিয়া উঠিল, তিনি যে ইঙ্গিতক্রমে নীহারেরই হস্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, নীহার কি এত ভাগ্যবতী !

এমন সময়ে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে মলিনা ভাবমগ্না ভগিনীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দূরে গঙ্গায় ষ্টীমারের বাঁশী চারিদিক কাঁপাইয়া সজোরে বাজিয়া উঠিবামাত্র নীহার চমকিয়া উঠিল, মলিনাও সেই সময়ে কহিল, "চমকাস্ কেন ? শ্যামের বাঁশী নয়, সে বাঁশী এত জোরে বাজে না। প্রাণের মধ্যে সে বাঁশী বাজে, তা কখনও শুনিছিস্ ?

"দে আমার চিঠি, আমি ভুলে ফেলে গেছি, তা তুই কেন আমার চিঠি পড়্ছিস্ ? ওকি অভ্যেস লো ?"

লজ্জিতা নীহার অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইল, সঙ্কোচভরে মাথা তুলিয়া আর দিদির মুখের প্রতি চাহিতে পারিল না। এ পত্র যদি আর কাহারও হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই নীহার দুকথা কহিতে ছাড়িত না, কিন্তু এ পত্র যে তরুণীর লজ্জারই বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে, সুতরাং সে কেমন করিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিবে।

তবে এ লজ্জা অপমানের নহে, আনন্দের পরম সঙ্কোচ।

শ্রীমতী সরসীবালা বসু ।

রামপুরহাট।

ভাগবত-ধর্ম্ম ।

১। ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার ।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া বনে যাইতেছেন। তাঁহার দুই স্ত্রী একজনের নাম কাত্যায়নী আর একজনের নাম মৈত্রেয়ী। ঋষির যাহা কিছু ধনসম্পত্তি ছিল সমস্ত দুই স্ত্রীকে ভাগ করিয়া দিলেন। কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীলোকের মত স্বামীকে বেশী কিছু বলিলেন না। কিন্তু মৈত্রেয়ী ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি ঋষিকে বলিলেন "আচ্ছা, আপনি ত আমাদের এই ধনসম্পত্তি দিলেন, ইহা দ্বারা আমার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ? যদি সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পত্তিই আমার হয়, তাহাতেই বা আমার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহা হইতে কি আমার অমরত্ব লাভ হইবে ?"

ঋষি মৈত্রেয়ীর মুখের পানে স্তম্ভিত হইয়া একবার চাহিলেন ও গম্ভীর ভাবে

বলিলেন, "না এই ধনসম্পত্তির দ্বারা অমরত্ব লাভ হইবে না, তবে টাকা কড়ি কিছু থাকিলে যেমন অন্ন বস্ত্রের কষ্ট থাকে না তেমনি তোমারও অন্নবস্ত্রের কষ্ট হইবে না। 'অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন' বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না।"

তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান বেদ তদেব মে ব্রূহি।" "ভগবন্ যাহা দ্বারা অমৃতত্ব না হইবে তাহা লইয়া আমি কি করিব? অতএব আপনি এই অমৃতত্বের যদি কিছু সন্ধান জানেন তাহাই আমাকে বলুন। এই সব টাকা কড়িতে আমার দরকার নাই।"

তখন যাজ্ঞবল্ক্য আত্মতত্ত্বের কথা মৈত্রেয়ীকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। মানুষ যে সংসারে আসিয়া ভালবাসার জাল বয়ন করে, স্ত্রী হইয়া স্বামীকে, স্বামী হইয়া স্ত্রীকে, পিতা হইয়া পুত্রকে তাহা ছাড়া বিত্তবন্ধু ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিকে ভাল বাসে—এই ভালবাসার রহস্যটা কি, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট একে একে বর্ণনা করিলেন।*

ঔদ্দালকি বলিয়া এক রাজা ছিলেন। তিনি বিশ্বজিৎ নামক এক যজ্ঞ করিয়াছেন। যজ্ঞের পর দান করিতে হয়, তাই রাজা কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন—যে যাহা চাহিতেছে তাহাকেই তাহা দান করিতেছেন। এই প্রকারে রাজা তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিলেন। নচিকেতা বলিয়া রাজার একটি পুত্র ছিল। সে তখন নিতান্ত বালক। বালক হইলে কি হয়, ছেলেটি অসাধারণ বুদ্ধিমান। রাজা যখন কতকগুলি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য গাভী ঋত্বিক ও সদস্যগণকে দান করিতেছিলেন সেই সময়ে নচিকেতার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। সে তাহার পিতাকে বলিল 'বাবা! এখনত তোমার সম্পত্তির মধ্যে আমি রহিয়াছি, তখন আমাকেও দান করিয়া ফেল না।"

রাজা পুত্রের কথায় প্রথমে কিছু বলিলেন না। নচিকেতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আমাকে কাহাকে দান করিবে?" এবারেও রাজা কিছু বলিলেন না। পুত্রের কথা যেন শুনিতে পান নাই এই প্রকার ভাব দেখাইলেন। নচিকেতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা! আমাকে কাহাকে দান করিবেন বলুন না?"

বার বার তিন বার। রাজা রাগিয়া আগুন, জোরে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাকে যমের হাতে দান করিলাম।"

নচিকেতা মনে মনে ভাবিলেন "যমের কি কার্য্য আমার দ্বারা সাধিত

* শুক্ল যজুর্ব্বেদের বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—২য় অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

হইবে ?” যাহা হউক সে কথা এখন আর ভাবিবার সময় নাই। তিনি তাঁহার পিতাকে বলিলেন—“তবে আমি যমের বাড়ী চলিলাম। সেখানে ত সকলকেই যাইতে হয় সুতরাং তাহাতে আর কষ্ট কি ?”

এই বলিয়া নচিকেতা যমালয়ে গমন করিলেন। যমরাজ তখন বাড়ীতে ছিলেন না। নচিকেতা অতিথিরূপে যমালয়ে গিয়াছিলেন, যমরাজ বাড়ীতে নাই কাজেই তাঁহার কোনরূপ অভ্যর্থনা হইল না; এই অবস্থায় নচিকেতা তথায় তিন রাত্রি অপেক্ষা করার পর যমরাজ বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া যম দেখিলেন ব্রাহ্মণ-পুত্র এই তিন দিন কাল তাঁহার গৃহে অনাহারে রহিয়াছে—তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি পাদ্য অর্ঘ্য, ভোজ্য প্রভৃতির দ্বারা ব্রাহ্মণ বালকের সেবা করিয়া, যমরাজ অতীব নম্রভাবে বলিলেন, “আপনি ব্রাহ্মণ বালক, আপনি আমার নমস্য। এই তিন রাত্রি আপনি আমার বাড়ীতে অনাহারে আছেন। সেই জন্য আপনি প্রত্যেক রাত্রির জন্য একটি করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বসমেত তিনটি বর আমার নিকট গ্রহণ করুন।”

নচিকেতা ভাবিলেন যম রাজের নিকট কি বর লওয়া যায়। যমালয়ে আসিয়া অবধি তাঁহার মনে একটা বড় সন্দেহের উদয় হইতেছিল, তাঁহার মনে হইতেছিল, হয়ত পিতা আমার উপর রাগ করিয়াছেন; আবার মনে হইতেছিল, যদিই বা আমি আবার বাড়ী ফিরিয়া যাই তাহা হইলে পিতা আমাকে হয় ত চিনিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি যমরাজকে বলিলেন, “মহারাজ! আমার পিতা যেন আমার উপর রাগ না করেন আর আমি বাড়ী ফিরিয়া গেলে যেন আমায় চিনিতে পারেন।”

যমরাজ বলিলেন “তথাস্তু, তোমার পিতা তোমার উপর রাগ করিবেন না এবং তুমি বাড়ী ফিরিয়া গেলে তিনি তোমাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন ও পূর্ব্বের মত স্নেহ করিবেন!”

নচিকেতা দ্বিতীয়বারে যমরাজকে বলিলেন “মহারাজ! শুনিয়াছি অগ্নির সাহায্যে যজ্ঞ করিয়া লোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। এই যে স্বর্গসাধন অগ্নি আপনি আমাকে এই অগ্নির তত্ত্ব উপদেশ করুন।”

যমরাজ একে একে অগ্নির তত্ত্ব সমস্ত বর্ণনা করিলেন। এইবার তৃতীয় বর। নচিকেতা যমরাজকে বলিলেন—

“যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।

এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্তুয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।"

"যাহারা মরিয়া যায় তাহাদের সম্বন্ধে মানুষের মনে অনেক সন্দেহ আছে কেহ কেহ বলেন মরণের পর মানুষ থাকে আবার কেহ কেহ বলেন মরণের পর কিছুই থাকে না। প্রশ্নটি বড়ই কঠিন। আমার ইহা আপনার নিকট শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি আমাকে এ বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। ইহাই আমার তৃতীয় বর।"

যমরাজ স্তম্ভিতভাবে সেই ব্রাহ্মণ বালকের মুখের প্রতি চাহিলেন, ভাবিলেন ইহার জন্য বালকের আন্তরিক ইচ্ছা হয় নাই। লোকের কাছে শুনিয়াছে, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। এই ভাবিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যমরাজ বলিলেন—

"দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
নহি সুজ্ঞেয়মনুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতা বৃণীষ
মামোপরোৎসীরতি মাসৃজৈনম্॥

"সর্ব্বনাশ্! এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? একি সহজ কথা? ইহার এক বিন্দুও সহজে বুঝিবার যো নাই। পূর্ব্বে দেবগণেরও ইহাতে সন্দেহ ছিল। এ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিওনা। ইহার বদলে অন্য কোন বর চাও।"

নিরস্ত হওয়া ত দূরের কথা, যমরাজের এই কথা শুনিয়া নচিকেতার আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন—

"দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥"

"বলেন কি? এ প্রশ্ন এত কঠিন যে দেবগণেরও ইহাতে সন্দেহ ছিল? আপনি স্বয়ং মৃত্যুর রাজা, আপনি বলিতেছেন যে এই তত্ত্ব সুজ্ঞেয় নহে। তবে ত আমাকে ইহার উত্তর জানিতেই হইবে। এবিষয়ে আপনার ন্যায় সদ্‌গুরু সহজে পাওয়া যায় না—সুতরাং আমাকে এই প্রশ্নেরই উত্তর জানিতে হইবে। ইহার পরিবর্ত্তে আমি অন্য কোনও বর লইব না।"

যম বলিলেন—

"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্য মশ্বান্।
"ভূর্ম্মেমহদায়তনং বৃণীষ
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥"

"এ প্রশ্নের উত্তর জানিয়া কি হইবে? বরং তাহার পরিবর্ত্তে শতবৎসর পরমায়ু সম্পন্ন পুত্রপৌত্র কামনা কর। হাতি ঘোড়া কি গরু প্রভৃতি অন্য পশু যত চাই, প্রার্থনা কর। স্বর্ণ লও, সুবিস্তীর্ণ পার্থিব রাজ্য প্রার্থনা কর। নিজে যত দিন ইচ্ছা বাঁচিয়া থাকিতে প্রার্থনা কর।"

তাহার পর যম নচিকেতাকে আরও কতই না লোভ দেখাইলেন পৃথিবীতে থাকিয়া মানুষের সহজে যে সমস্ত কামনা সফল হয় না, সেই সমস্ত দিতে চাহিলেন। কিন্তু নচিকেতা অটল, তিনি শেষে বলিলেন, "ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যো" ধন সম্পত্তি মানুষকে তৃপ্ত করিতে পারে না। "যোঽয়ং বরোগূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্য স্তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥" "এই যে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বর, যাহা আপনি অত্যন্ত গোপনীয় বলিলেন, তাহা ছাড়া নচিকেতা অন্য বরের প্রার্থী নহে।" যম আর পারিলেন না নচিকেতাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিলেন। উপদেশ দিবার সময় যমরাজ নচিকেতাকে বলিলেন।

"স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতো ঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং স্রঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ।"

"দেখ, নচিকেতা তোমাকে আমি এতক্ষণ কত প্রকার প্রলোভন দেখাইলাম। যে সমস্ত দ্রব্য খুব প্রীতিপ্রদ ও রমণীয়, তাহা আমি তোমাকে কতই না দিতে চাহিলাম। যে কামিনী কাঞ্চণের মালাতে শত শত মানুষ বাঁধা হইয়া রহিয়াছে, আমি তোমাকে সেই মালায় বাঁধিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তুমি কিছুতেই বাঁধা পড়িলে না। "তুমি ধন্য। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে তুমি যে প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ সে প্রশ্ন জানিবার জন্য সত্যই তোমার অধিকার হইয়াছে।"

ঐহিক সুখ লালসায় যে লোক একেবারে ডুবিয়া আছে, সেও অনেক সময়ে অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাহাকে সে প্রশ্নের

* কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়া কঠোপনিষৎ প্রথমোধ্যায়ঃ।

উত্তর দেওয়ায় কোনই ফল নাই। শূন্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে জিজ্ঞাসা করে, আত্মা কি, মৃত্যুর পরে কি হয়, ঈশ্বর কি বস্তু; তাহাকে যদি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিবে না। কাম্যবস্তুর অসারতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। সংসার ত্যাগ করিয়া, ভোগ্য-বস্তু পরিত্যাগ করিয়া এক কথায় সন্ন্যাসী সাজিয়া যে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বা সমস্ত তত্ত্ব জানিতে হইবে তাহা নহে। বিষয় ভোগ করিতে করিতে বিষয়ের মধ্যে থাকিতে থাকিতেই মানুষের মনে অনেক সময়ে একটা অতৃপ্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, এই যে কাম্য বস্তু বা ষড়্ বিষয় ইহার ঊর্দ্ধে একটা কিছু আছে, তাহার ছায়া যখন অস্পষ্টভাবে মানুষের মানস নেত্রের সমক্ষে প্রকাশিত হয় সেই অবস্থায় আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিলে সে ব্যক্তি তাহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। যাহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই কাম্য বস্তু সমূহের নশ্বরতার কথা জাগে নাই, সীমাবদ্ধ ও ক্ষয়শীল বিষয় রাশিতে অসন্তুষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি কোনও একটি অসীম ও অবিনশ্বর পদার্থের জন্য এক মুহূর্ত্তও ব্যাকুল হয় নাই, তাহার নিকট পরলোকের কথা, মানবাত্মার অমরত্বের কথা বা ঈশ্বর তত্ত্বের কথা বর্ণনা করিয়া কি হইবে?

যম বলিলেন,

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ"

"আত্মতত্ত্ব অনেকের ভাগ্যে শ্রবণ করাই ঘটিয়া উঠে না, শুনিয়াও অনেকেই তাহা ধারণা করিতে পারেন না, কারণ ইহার উপদেষ্টাও দুর্লভ, শ্রোতাও দুর্লভ।"

ইহা ছাড়া আর একটি কথা বিবেচনা করা উচিত। সাংসারিক প্রত্যক্ষ বিষয়ের ঊর্দ্ধে যাহাদের চিত্ত কখনও আরোহণ করিতে না পারে তাহারা জটিল আধ্যাত্মিক বিষয় কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না। এই জন্যই যমরাজ বলিলেন,

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।

দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥

"যেমন এক জন অন্ধ যদি আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায় তাহা হইলে তাহারা নানা দিকে কেবল মাত্র ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায় পথ নির্ণয় করিয়া ঈপ্সিত স্থানে যাইতে পারে না। সেই রূপ অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান অনেক লোক আপনাদিগকে ধীমান বলিয়া পরিচয় প্রদান করে এবং পণ্ডিত মনে করিয়া থাকে; কিন্তু সেই কুটিল গতি মূঢ়গণ কামভোগে মোহিত হইয়া স্বর্গ-নরকাদি পর্য্যটন করিয়া থাকে, অভীষ্ট স্থান দেখিতে পায় না। প্রমাদ গ্রস্ত ও মোহাচ্ছন্নচিত্ত অবিবেকীর নিকট আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় না ঐ অবিবেকী কেবল, এই পরিদৃশ্যমান, লোক ব্যতীত পরলোক নাই এই প্রকার বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ আমার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।"

অধ্যাত্ম ধর্ম্মের ইহাই ভিত্তি, ব্রহ্ম বিদ্যার ইহাই অধিকার। উত্তর মীমাংসায় বা বেদান্ত দর্শনে বলা হইয়াছে যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন শিষ্য ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবেন। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা অনর্থক। এই সাধন চতুষ্টয় কি? বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। ষট্‌সম্পত্তি বলিতে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টিকে বুঝায়। পূর্ব্বে যে দুইটি ইতিহাস বর্ণনা করা হইল তাহা পাঠে বুঝিতে পারা যাইবে মৈত্রেয়ী ও নচিকেতা সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়াছিলেন বলিয়াই যাজ্ঞবল্ক্য ও যম তাঁহাদের ব্রহ্ম বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী এই মহাপুরাণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ পুরাণম্।" অর্থাৎ এই পুরাণ গায়ত্রী নামক ব্রহ্মবিদ্যা। আবার শ্রীমৎ জীবগোস্বামী ও তাঁহার টীকায় প্রাচীন বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন "অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম-সূত্রাণাং" এই গ্রন্থ ব্রহ্ম-সূত্রের অর্থ। আবার বলিতেছেন "গায়ত্রী-ভাষ্য-রূপোঽসৌ" অর্থাৎ এই মহাপুরাণ গায়ত্রীর

ভাষ্য স্বরূপ। অথচ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ সর্ব্বসাধারণকেই দেওয়া হইয়াছে। যে বস্তু মৈত্রেয়ী বা নচিকেতা উপযুক্ত অধিকার প্রমাণ করার পর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত তাহা সকলের জন্য প্রকাশ করিলেন কেন?

এই প্রশ্নটি অতি গভীরভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমি মনে করি এই প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর নিরূপণ করিতে না পারিলে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করা একেবারে অসম্ভব। মানবমাত্রেরই ক্রমবিকাশের কথা আজকাল অতিশয় সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে—ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় কিপ্রকারে মানবের ক্রমে ক্রমে চিত্তবিকাশ হয় সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রাচীন ইতিহাস আছে।

বরুণের পুত্রের নাম ভৃগু, তিনি একদিন তাঁহার পিতাকে বলিলেন—"ভগবন্ আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন।" বরুণ বলিলেন "যতো বা ইমানি ভূতানিজায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।" যাহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যদ্দ্বারা জীবন ধারণ করে, সময়ে যাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকেই শ্রবণাদি সাধন দ্বারা বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর।"

ভৃগু পিতার নিকট এই উপদেশ পাইয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন তপস্যা করার পর ভৃগু স্থির করিলেন যে অন্নই ব্রহ্ম। কারণ তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন যে অন্ন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পর অন্নদ্বারা জীবন ধারণ করে এবং সময়ে অন্নে লীন ও একীভূত হয়। ভৃগু অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনের তৃপ্তি হইল না। ফলে তিনি পুনরায় তাঁহার পিতাকে বলিলেন "পিতঃ ব্রহ্ম উপদেশ করুন।" বরুণ বলিলেন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মেতি।" তপস্যার দ্বারা ব্রহ্ম জানিতে চেষ্টা কর। যতদিন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি না হইবে ততদিন তপস্যাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া রাখ। ভৃগু আবার তপস্যা করিতে গমন করিলেন।

কিছু দিন তপস্যা করার পর ভৃগু বুঝিলেন যে প্রাণই ব্রহ্ম। কারণ প্রাণ হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পর প্রাণ দ্বারা জীবন ধারণ করে আবার সময়ে প্রাণে বিলীন হয়। এই সকল লক্ষণে প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলেন বটে কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি তাঁহার পিতার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার পিতা তাঁহাকে পূর্ব্বরূপ উপদেশ দিলেন।

তৃতীয় বার তপোনুষ্ঠান করিয়া ভৃগু বুঝিলেন মনই ব্রহ্ম। কিন্তু তাহাতে

ও তৃপ্তি হইল না। পিতার আদেশ ক্রমে পুনর্ব্বার তপস্তা আরম্ভ করিলেন ও বুঝিলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। ইহাতে ও হইল না। শেষে ভৃগু তপস্যার পর পর বুঝিলেন—

"আনন্দো ব্রহ্মেতি···। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

"আনন্দ হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়। উৎপত্তির পর ঐ আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে ঐ আনন্দেই লীন হয়।" *

মানব জ্ঞানের এই ক্রম বিকাশের যে পাঁচটি সোপানের কথা বলা হইল ইহাই পঞ্চকোষ। ইহাদের নাম অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়।

"অন্নং প্রাণো মনোবুদ্ধিরানন্দ শ্চেতি পঞ্চতে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥"

পঞ্চদশী ১।৩৩।

যেমন কীটগণ (গুটি পোকা) কোষ, নির্ম্মাণ করিয়া সেই কোষমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করে। সেই প্রকার আত্মা স্ব স্বরূপের তত্ত্ব ভুলিয়া সংসারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের একটি কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা উচিত। বিজ্ঞানময় কোষের আর একটি নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধির ভূমিই ব্রহ্মবিদ্যার এবং ভাগবতধর্ম্মের ভূমি। সমগ্র ভগবদ্গীতা গ্রন্থের কেন্দ্র স্থলে এই 'বুদ্ধি' প্রতিষ্ঠিত। "মনসস্তু পরাবুদ্ধিঃ" মনের পর বুদ্ধি। গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে এই বুদ্ধির ভূমিতে তুলিবার জন্তই চেষ্টা করিয়াছেন।

গীতা বলিতেছেন।

"এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যাযুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ২—৩৯

"হে পার্থ, যে বুদ্ধিযুক্ত হইলে, তুমি কর্ম্মবন্ধ ত্যাগ করিতে পারিবে, জ্ঞান যোগ অনুসারে তাহা বলিলাম, এইবার কর্ম্মযোগ অনুসারে তাহার কথা বলিতেছি—

আবার বলিতেছেন "বুদ্ধৌশরণমন্বিচ্ছ" বুদ্ধিতে শরণ গ্রহণ কর। "বুদ্ধি-

* কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়া তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—তৃতীয়া বল্লী।

যুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুস্কৃতে” বুদ্ধি যুক্ত হইয়াই স্বর্গাদি প্রাপক ও নরকাদি প্রাপক এই উভয়বিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ কর। “নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য” অবশীকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই।

সমগ্র গীতাশাস্ত্রের কেন্দ্রস্থলে এই ‘বুদ্ধি’ প্রতিষ্ঠিত, মনের ভূমি হইতে বুদ্ধির বা বিজ্ঞানময় কোষের ভূমিতে উত্তোলন করাই গীতা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। গীতায় ভগবান বলিতেছেন—

“তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥ ১০।১০

“যাঁহারা আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনাকারী, সেই সকল ভক্তকে আমি ঈদৃশ বুদ্ধি যোগ প্রদান করি, যদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।”

এই ‘বুদ্ধি’ সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন।

“নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ২—৪০

“এই বুদ্ধিযোগ আরম্ভ করিলে তাহা বিফল হয়না। ইহাতে প্রত্যবায় নাই। এই ধর্ম্মের অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।”

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে তাহার উৎপত্তির ইতিহাস এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাসদেব বেদবিভাগ করিলেন, পঞ্চমবেদ স্বরূপ মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা হইল না তখন তিনি নারদের উপদেশ মত এই ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিলেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রথম চিত্র। উরুভঙ্গ দুর্য্যোধন ভূমি শয্যায় শায়িত, অপর দিকে ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শ—মহাভারতীয় সাধনার পরিপক্ক ফল মহাপ্রাণ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পূর্ব্বে মানবের ক্রমবিকাশের কথা বলিয়াছি। মানব যেমন এক অবস্থায় মনোময় কোষের উর্দ্ধে বিজ্ঞানময় কোষে বা বুদ্ধির ভূমিতে আরোহণ করে, তেমনি সমাজ ও সমষ্টি ভাবে মনের ভূমির উর্দ্ধে আরোহণ করে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষীয় সমাজ ও তেমনি মনের ভূমির উর্দ্ধে বুদ্ধির ভূমিতে আরোহণ করিল। ভাগবত শাস্ত্রের সেই খানেই আরম্ভ এবং সেই জন্যই ভাগবত গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যা সাধারণ ভাবে সমস্ত সমাজকে প্রদত্ত হইল।

নৈমিশারণ্যে বসিয়া ভাগবত শাস্ত্রের কথা আরম্ভ হইতেছে। শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় এই নৈমিশারণ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ব্রহ্মণা বিনির্ম্মিতস্য চক্রস্ত মনোময়স্য নেমিঃ শীর্য্যতে কুণ্ঠীর্ভবতি যত্র তন্নেমিশং নেমিশমেব নৈমিশম্।" "ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মনোময় চক্রের নেমি যথায় কুণ্ঠিত হয় সেই স্থান নৈমিশ।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি ষড়্ বিষয় অর্থাৎ পঞ্চইন্দ্রিয় ও মন ইহাদের ভোগ্য বিষয়ের অসারতা উপলব্ধ করিয়া মানব যখন অনন্তের জন্য আকুল হয় তখনই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার জন্মে। দেবকীর ছয় পুত্র কংস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়ার পর অনন্তদেব বলরামরূপে আবির্ভূত হইলেন। প্রাচীন গোস্বামী টীকাকারগণ এই ছয় পুত্রকে ষড়্ বিষয়াঃ, বলিয়াছেন। 'বুদ্ধি'র ভূমিই ব্রহ্মবিদ্যার ভূমি এবং শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রও এই ভূমিতে আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে মহাভারত অপর দিকে শ্রীমদ্ভাগবত আর মধ্যস্থলে ভগবদ্গীতা। এই গীতা গ্রন্থে একদিকে মহাভারতের সাধনার যাহা সার কথা তাহা সংগৃহীত হইয়াছে, অপর দিকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের যাহা বীজ তাহাও এই গীতাগ্রন্থে আছে। কথাগুলি ক্রমশঃ আরও বিশদ করা যাইবে।

বীরভূমের খনিজ সম্পদ। (১)

লৌহ।

ঢেকারু জাতির বিবরণ প্রসঙ্গে বীরভূম জেলায় লৌহ ব্যবসায়ের কথা বলা হইয়াছিল। বীরভূম অধুনা খনিজ পদার্থের জন্য বিখ্যাত নহে, এবং ইহার খনিজ সম্পদও তাদৃশ প্রচুর নহে। লৌহ, কয়লা, ঘুটিং, এবং ৩।৪ প্রকারের প্রস্তর ব্যতীত, বীরভূমের আকরে আর কোন মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে লৌহই সর্ব্বপ্রধান, কয়লার আকর একটি মাত্র আছে; ঘুটিং সংগ্রহ করিবার জন্য এবং তাহা হইতে চুণ প্রস্তুত করিবার জন্য এপর্য্যন্ত কোন বড়রকম চেষ্টা হয় নাই, এবং প্রস্তরের আকর সমূহ হইতে মাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী তাঁহাদের প্রয়োজন মত প্রস্তর লইয়া থাকেন। ইহাই বীরভূমের খনিজাত দ্রব্য সম্ভারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বীরভূম প্রদেশে যেরূপ ভাবে লৌহের কার্য্য পূর্ব্বে করা হইত, সেরূপ আর বঙ্গদেশের, এমনকি ভারতবর্ষের কুত্রাপিও হইত না। বর্ত্তমান কালে, টাটা লৌহ কোম্পানী, খুব সমারোহে, বৈদেশিক মূলধন ও বৈদেশিক কল কারখানা দ্বারা ভারতীয় লৌহকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাই-

তেছেন। এই সময়ে, বঙ্গদেশের একটি নগণ্য জেলায়, এই অতি প্রয়োজনীয় ধাতুটিকে সুলভে কার্যাকরী করিবার কিরূপ চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার আলোচনা নিষ্ফল হইবে না।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে বীরভূম জেলায় যে সমস্ত স্থানে কঙ্করের স্তর আছে, প্রায় সে সমস্তের তলদেশে ধাতব লৌহের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে অতিশয় বিস্তৃত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; আবার এই ধাতুর মূল্যও সামান্য নহে, কারণ ইহাতে শতকরা ৪০ হইতে ৬০ ভাগ লৌহ আছে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই অসংবদ্ধ ভাবে এই ধাতু হইতে বীরভূমের অধিবাসীগণ প্রয়োজন মত লৌহ নিষ্কাসন করিতেন। বাণিজ্য উদ্দেশ্যে ইহা পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত না। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, ইন্দ্রনারায়ণ নামক একজন ব্রাহ্মণ, বর্দ্ধমান কৌন্সিলের হাত দিয়া, সরকারের নিকট, বীরভূমের লৌহের আকর সমূহ চালাইবার নিমিত্ত এক দরখাস্ত করেন। দরখাস্তের মধ্যে একটা প্রস্তাব এই ছিল যে, চারি বৎসর পর হইতে উক্ত ব্রাহ্মণ বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব স্বরূপ দিবেন। সরকার জানিতেন যে ইহা এক রকম অসম্ভব; তাহা জানিয়াও তাঁহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং কোন রূপ পাট্টাও গ্রহণ করেন নাই। বীরভূমের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক বৈদেশিক উপায়ে লৌহ কারবারের প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা হইয়াছিল, এই খানেই তাহার অবসান হয়।

১৭৭৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের পশ্চিম প্রদেশে, কোম্পানীর জমিদারী সমূহে, লৌহ তৈয়ারী করিবার এবং তাহা বিনা শুল্কে বিক্রয় করিবার অধিকার প্রার্থনা করিয়া, মট ও ফারকুহার নামক এক ইউরোপীয় কোম্পানী (Motte & Farquhar Co.) কোম্পানীর গবর্ণমেণ্টের সমীপস্থ হন। ইহার পূর্ব্ব হইতে পঞ্চকোট ও বীরভূম জেলার স্থানে স্থানে, লৌহ প্রস্তুত করিবার অধিকার, সমার ও হিটলী নামক অপর এক ইউরোপীয় কোম্পানী (Summer & Heatly & Co) ভোগ করিতে ছিলেন। ফারকুহার কোম্পানীর প্রস্তাবে এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন কথা ছিল না। তাঁহাদের একটা সর্ত্ত ছিল যে বর্দ্ধমানস্থিত কৌন্সিলের মেম্বরগণ, এবং কলিকাতার বাহিরে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ যেন তাঁহাদের ব্যবসায়ে কোন প্রকারে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ না করেন। বিরোধ প্রভৃতির মীমাংসার ভার সম্পূর্ণরূপে গবর্ণরের কৌন্সিলের উপর থাকিবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা শেষোক্ত সর্ত্তের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন। কোম্পানীর প্রায় সমস্ত মফঃস্বলস্থ কর্ম্মচারীগণ নিজে নিজে ব্যবসাদার ছিলেন; এবং নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তাঁহারা নানাবিধ অন্যায় আচরণ করিতেন।

ফার্কুহার কোম্পানী প্রথম কার্য্য করেন মানভূম জেলার ঝড়িয়া নামক স্থানে। আজ কাল ঝড়িয়াতে উৎকৃষ্ট পাথুরিয়া কয়লার প্রাচুর্য্য দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে ঝড়িয়াই লৌহ কারখানা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু তৎকালে ঝড়িয়ার পাথুরিয়া সমৃদ্ধি অজ্ঞাত ছিল। যাহা হউক, যে সর্ত্তে তাঁহারা ঝড়িয়াতে কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সর্ত্তে, তাঁহাদের সহিত বীরভূমের লোহা মহল সমূহ বন্দোবস্ত করিবার কথা স্থির হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদিগকে যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে ফার্কুহার কোম্পানী, গোলাগুলি প্রস্তুত করিয়া, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে, ইংলণ্ড হইতে আনীত দ্রব্যের ⅘ গুণ মুল্যে সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ছোট নাগপুরের রামগড় প্রদেশস্থিত সিদপা নামক স্থানে একটি সীসার আকর এই কোম্পানী পরিচালন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; লভ্যের বিংশতি ভাগ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিতে তাঁহারা স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে ফার্কুহার সাহেব লৌহ মহল দখল করিবার অনুমতি পাইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে ঝড়িয়ার ধাতু অপেক্ষা বীরভূমের ধাতু তাঁহার কার্য্যসাধনের পক্ষে বেশী উপযোগী। তাহা দেখিয়া তিনি, তাঁহাদের পূর্ব্ব সর্ত্তের পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিলে তাহা মঞ্জুর হইল। যদিও ফারকুহার কোম্পানী এই রূপ ভাবে কোম্পানীর গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠ পোষকতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, অন্য দিক হইতে বাধা আসিয়া ইহাকে বিপন্ন করিতে লাগিল। রাজ নগরের রাজা ও জায়গীরদারগণ নানাবিধ গোলযোগের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

১৭৭৯ খৃঃ অব্দে অনেক পত্র লেখালিখীর পর, গবর্ণমেণ্ট, ফার্কুহার সাহেবকে দাদন স্বরূপ পনর হাজার টাকা দান করেন। এই টাকা লইয়া তাঁহাদের furnace বা চুল্লি সমুহ সম্পূর্ণ করিবার কথা ছিল; ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। কেবল জানিতে পারা যায়, যে লৌহ মহলের রাজস্ব লইয়া জায়গীরদারগণ বিশেষ বিরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা লোহা মহলের রাজস্ব তাঁহাদের প্রাপ্য বলিয়া

দাবী করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ফার্কুহার সাহেবকে বন্দোবস্ত দিবার পূর্ব্বে কোম্পানীর গবর্ণমেণ্ট এই পাওনা আদায় করিয়াছিলেন। ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িয়া, ফার্কুহার সাহেব লৌহ কারবারের কল্পনা পরিহার করেন। ফল্‌তার (Falta) বারুদের কারখানায় তাঁহার চাকুরী হওয়ায় তিনি সেখানে চলিয়া যান। ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত লোহা মহলের সত্ব তাঁহার ছিল ; তৎপরে তাহা জমীদারগণ ফিরিয়া পান এবং সেই সময়ে তাঁহারা মহলের কতক অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। নূতন অধিকারীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ লাটের সামিল লৌহের আকর সমুহের উপর কর ধার্য্য করিয়া আদায় করিতে লাগিলেন। ফলে তাহা লইয়া নানাবিধ মামলা মোকদ্দমা চলিতে গেল। এই রূপে লোহা মহলের সত্ব ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেণ্টের হস্তচ্যুত হয়।

S. G. T. Heatly (হিটলী) সাহেব লিখিত "Contributions towards a History of the Development of the Mineral Resources of India."—হইতে পূর্ব্বোক্ত বিবরণের সঙ্গে ইহাও অবগত হওয়া যায়, যে সেই সময়ে বীরভূমে একেবারে ভারতীয় প্রণালীতে যে কাঁচা লৌহ প্রস্তুত হইত তাহা কলিকাতার বাজারে মণ করা পাঁচ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইত ; বালেশ্বরের একই কদরের লৌহ, মণ করা সাড়ে ছয় টাকা, এবং বিলাতী লৌহ দশ হইতে এগার টাকায় বিক্রয় হইত। ফার্কুহারের পথে জমিদারগণ বিঘ্ন উৎপাদন না করিলে, ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত লৌহ আরও সস্তাদরে বিক্রয় করা যাইত সন্দেহ নাই।

তার পর, অর্দ্ধ শতাব্দী কাল লৌহের কারবার সমন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। দুই এক স্থানে প্রাচীন উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইতে লাগিল সন্দেহ নাই, তবে ক্রমশঃই লৌহ ব্যবসায় অবনত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে Welby Jackson—ওয়েল্‌বি জ্যাকসন নামক একজন সাহেব বীরভূমের লৌহের কারবারের সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তৎপাঠে অবগত অবগত হওয়া যায় যে ধাতু হইতে ২৫ মণ লৌহ গলাইয়া বাহির করিতে, ৪ দিন ও ৪ রাত্রি কাল সময় লাগিত এবং ২৫৲ টাকা ব্যয় হইত। লৌহ মহলের ইজারাদারগণ প্রত্যেকবার গলাইবার জন্ত এক টাকা এবং পরিষ্কৃত লৌহের মণ প্রতি ছয় পয়সা দাবী করিতেন। ইজারাদারদের এই বিশেষ অধিকার কিরূপে জন্মিল তাহা জ্যাকসন সাহেব স্থির করিতে পারেন নাই। সদর দেওয়ানী আদালতের কতকগুলি নিয়ম হইতে

বুঝিতে পারা যায়, যে কার্‌হার সাহেবের স্বত্ব ত্যাগের পর, যে সময়ে লোহামহল হস্তান্তরিত হয় সেই সময় নগরের রাজার পক্ষ হইতে তাঁহার জমীদারী মধ্যস্থ লোহামহল সমূহ একটি স্বতন্ত্র লাটে বিক্রীত হয়; তখন হইতে গবর্ণমেন্টের মনোযোগের অভাবে ইজারাদারেরা, তাঁহাদের প্রাপ্য এই একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

১৮৫০ খৃঃ অব্দের পর, ভারতবর্ষে রেল লাইন স্থাপনের প্রস্তাব অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হয়। সেই উপলক্ষ্যে বিলাতের Court of Directors, ডাক্তার ওল্ডহাম নামক, একজন সাহেবকে, ভারতের ধাতব লৌহ ও তাহা প্রস্তুত করিবার উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত করেন ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ওল্ডহাম (Oldham) সাহেব তাঁহার অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়া, বীরভূম ও দামোদরের উপত্যকাস্থিত ধাতব লৌহ সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখেন। বঙ্গদেশীয় ধাতব লৌহের প্রকৃতি ও অবস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য তাঁহারই রিপোর্টে সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিত হয়। উক্ত রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে সাধারণতঃ যে আকারে এই লৌহময় ধাতু পাওয়া যায়:তাহার স্তর অধিকাংশ স্থলেই ৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। কোমল মেটে পাথরের মধ্যে যে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র বিদ্যমান থাকে, তাহাই আশ্রয় করিয়া এই ধাতু পাওয়া যায়। প্রধানতঃ মাটি এবং লৌহ ও অম্লজানের সংমিশ্রণজাত ক্ষার, যাহাকে Magnetic oxide of Iron বলে, তাহা লইয়াই এই ধাতু গঠিত। এই ধাতু হইতে যে পরিমাণ লৌহ পাওয়া যাইতে পারে তাহার হিসাব ওল্ডহাম সাহেব যাহা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা বেশী লৌহের অস্তিত্ব পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে।

বীরভূম জেলার ৫টি কেন্দ্রে, সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রণালীতে লৌহ প্রস্তুত হইত। বেলিয়া, নারায়ণপুর, দেহচা, ধামড়া এবং গণপুরে, খুব বিস্তৃত আকারে ধাতব লৌহ গলান কার্য্য চলিত। এই সমস্ত স্থলে তৎকালে furnace বা চুল্লির সংখ্যা, ভারতের অপরাপর স্থান অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, এবং চুল্লির সংখ্যাধিক্যের জন্য বীরভূম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এক দেহচা গ্রামেই ত্রিশটি চুল্লি লৌহ-নিষ্কাসন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। ধাতু হইতে লৌহ বাহির করা কার্য্যটি মুসলমানেরা সম্পাদন করিত; এই লৌহকে পরিষ্কার করিয়া বিক্রয়োপযোগী করিবার ভার হিন্দুদের উপর ছিল। প্রত্তি চুল্লি হইতে গড়ে বার্ষিক ৩৪ টন অর্থাৎ ৯৫২ মণ লৌহ উৎপন্ন হইত। এবং শুনিতে

পাওয়া যায় যে এইরূপ বৃহদাকারের চুল্লি প্রায় ৭০টি ছিল, এবং তাহা হইতে বাৎসরিক ২৩৮০ টন অর্থাৎ ৬৬৩৮০ মণ কাঁচা অর্থাৎ অপরিষ্কৃত লোহা উৎপন্ন হইত। এই সমস্ত চুল্লির একটা বিশেষত্ব এই ছিল, যে চুল্লির তলদেশে গলিত ও তরল আকারে এই কাঁচা লৌহ পাওয়া যাইত। সংশোধন বা পরিষ্কার করিবার যে প্রণালী বীরভূমে অনুসৃত হইত, তাহা অধ্যাপক বল (Professor V. Ball, author of Ecomic Geology of India) সাহেবের মতে, বাস্তবিক পক্ষে puddling process ছিল। অর্থাৎ ঢালাই লৌহ হইতে পিটান লৌহ তৈয়ারী করিবার যে প্রণালী ইহাও সেইরূপ ছিল। প্রণালীটি এইরূপ; কোন প্রকারের দৃঢ় মৃত্তিকা সংযোগে ধাতু হইতে সদ্যোজাত তরল লৌহকে খুব আলোড়িত করা হইত; এইরূপ আলোড়ন করার ফলে যখন সমস্ত পদার্থটি নরম ময়দার আকার ধারণ করিত তখন উহাকে টানিয়া পিটাইয়া মোটা পাতে পরিণত করা হইত। এইরূপে ১০ মণ কাঁচা লোহা হইতে ৭ মণ দশ সের পাকা লোহা প্রস্তুত হইত। তাহা হইলে বাৎসরিক উৎ-পন্ন দাঁড়ায়; ১৭০০ টন; এবং এই অবস্থায় আনিতে ব্যয় হইত টন প্রতি ৪২৷৷০ বিয়াল্লিস টাকা আট আনা। বাজারে বিক্রয়োপযোগী বার (Bar) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শত করা ৫০ পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় ধরিলে, টন করা ব্যয় দাঁড়ায় ৬৩৸০ তেষট্টি টাকা বার আনা। সেই সময়কার আমদানী লৌহের মূল্য ইহা অপেক্ষা কম থাকায়, বাজারে বীরভূমের লৌহের কাট্‌তি ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছিল; যদিও ফার্কুহার সাহেবের চেষ্টায় বীরভূমের লোহা, আমদানী লোহার অর্দ্ধেক মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইত। একটা কথা বলা হয় নাই, যে দেশীয় চুল্লিতে কেবল মাত্র কাঠের কয়লা ব্যবহৃত হইত। Jackson সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে লোহা মহলের নিকটবর্ত্তী স্থানে জ্বালানি কাঠের অভাব ক্রমশঃই বাড়িতে ছিল। বিলাতী লোহা পাথুরিয়া কয়লা সংযোগে প্রস্তুত হইত। কাঠের কয়লা দ্বারা প্রস্তুত হইত বলিয়া বীরভূমের লৌহ নরম হইত, এবং কোন কোন কার্য্যের জন্ত এই লৌহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহা হউক যে সমস্ত কারণে দেশীয় প্রথায় প্রস্তুত লৌহের কারবার হ্রাস পাইতে লাগিল, তাহার মধ্যে ইন্ধনের অভাবই ক্রমশঃ গুরুতর হইতেছিল। অন্ত দিকে ধাতব প্রস্তর সরবারহ করিবারও কোন বন্দোবস্ত ছিলনা। প্রধানতঃ এই দুইটি কারণেই বীরভূমে লৌহ প্রস্তুত ব্যবসা লুপ্ত হইয়াছে।

বিদেশীয় পদ্ধতিতে লৌহ প্রস্তুত করিবার চেষ্টাও অনেকবার হইয়াছিল।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতার ম্যাকে কোম্পানী, Birbhum, Iron Works Company নামক একটি লৌহার কারবার খুলিয়া, মহম্মদবাজারে কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক বৎসর ধরিয়া এই কারবার চলিয়াছিল। প্রথম কয়েক বৎসর একেবারে ক্রমাগত লোকসান হইয়াছিল এবং তাহার জন্য কারখানা মধ্যে মধ্যে বন্ধ থাকিত। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। ম্যাকে সাহেবের কারখানার দেশীয় লৌহ-কর্ম্মকারগণ নিযুক্ত হইয়াছিল, ফলে তাহারা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে লৌহ গলান ছাড়িয়া দিয়াছিল; তারপর ইজারাদার মহাশয়েরা তাঁহাদের সেগামীর গুরুভার হইতে এই কর্ম্মকারগণকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন নাই। এই দুই কারণে, দেশীয় মতে লৌহের কারবার একেবারে লোপ পাইতে বসিল। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে দেহচা নামক গ্রামে, যেখানে পূর্ব্বে ৩০টি চুল্লিতে কার্য্য হইত সেখানে একটি মাত্র চুল্লি অবশিষ্ট থাকিল। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে, লৌহ মহলের জমিদার নিজে চুল্লি গুলি পুনঃ স্থাপিত করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে দেহচা স্থিত শেষ চুল্লিটিও বন্ধ হইয়া যায়। এবং সেই সঙ্গে বঙ্গদেশের মধ্যে, সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিক্রমে লৌহ প্রস্তুত ব্যবসায়, যাহা একমাত্র বীরভূমেই ছিল, তাহা কিছুদিনের জন্য লুপ্ত হইল। ইহার ৩ বৎসর পরে গবর্ণমেণ্টের Geological Survey বিভাগের কর্ম্মচারী Mr. Hughes তাঁহার রিপোর্টে বীরভূমের লৌহ কারবার সম্বন্ধে অনেক আশার কথা লিপিবদ্ধ করেন ইহাতে কিছুদিন পরেই, কলিকাতার বরণ কোম্পানী নবোদ্যমে কার্য্যারম্ভ করেন; কিন্তু এই শাপগ্রস্থ ব্যবসায়ে তাঁহাদিগকেও প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এবং কয়েক মাস মাত্র কার্য্য চালাইয়া তাঁহারা কারবার বিস্তৃত করিবার কল্পনা একেবারে পরিত্যাগ করেন। বরণ কোম্পানীর কারখানা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে বিদেশীয় মতে বীরভূমে লৌহের কারবার চালাইবার শেষ চেষ্টা নির্ব্বাপিত হয়। দেশীয় প্রণালী মতে কার্য্য ২।৩ বৎসর পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এইরূপে বীরভূমের লৌহের কারবারের কথা ক্রমশঃই লোকে বিস্মৃত হয়।

এখনও বরণ কোম্পানীর সুবৃহৎ কারখানার ভগ্নাংশ দণ্ডায়মান আছে; আর সংগৃহীত ধাতব প্রস্তরের বৃহৎ স্তূপ সমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় রূপে পথিকের ভ্রান্তি আনয়ন করিতেছে। আমাদের গবর্ণমেণ্টও আকরজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। বীরভূমের লৌহ সম্পদের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইবে কি?

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত।

সঞ্চয়।

ভারতের ইতিহাস ও তাহার শিক্ষা।

ভারতবর্ষের করদ ও মিত্র নৃপতিগণ বর্ত্তমান যুগের উন্নততম শিক্ষার আলোকে কেবলমাত্র নিজ নিজ রাজ্যের নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের যথার্থ মঙ্গল যেরূপ গভীর ভাবে আলোচনা করেন, তাহাতে প্রাণে বড়ই আশা ও আনন্দের উদয় হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়া 'ভারতের ইতিহাস ও তাহার শিক্ষা' এই সম্বন্ধে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রচার করেন। এই প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই প্রবন্ধটি 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' নামক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্বকালে ভারতের অদৃষ্টে যে সমস্ত অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—নিম্নলিখিত গুলিই তাহার কারণ—

১। সুব্যবস্থিত ও সুচিন্তিত শাসন নীতির অভাব এবং তাহা হইতে উৎপন্ন দোষযুক্ত শাসন-পদ্ধতি।

২। কর্ম্মচারীগণের উপর বিশ্বাসের অভাব।

৩। শাসন-কর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক শাসন কার্য্যে সহায়তার জন্য অসৎ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন।

৪। শাসকগণের চরিত্রে সদ্বিবেচনার অভাব ও তাহার ফলে সত্যাসত্য নির্ণয়ে অক্ষমতা। ইহার ফলে, শাসকগণ, স্বার্থপর ব্যক্তিগণের নিকট যাহা শুনিতেন, বিনা বিচারে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন।

৫। ষড়যন্ত্র দমনের চেষ্টার অভাব।

৬। সকলের সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে ন্যায় বিচারের অভাব।

৭। শান্তি স্থাপনার্থ আন্তরিক চেষ্টার অভাব।

৮। অবাধ বাণিজ্যের অভাব।

৯। শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চরিত্রে নিঃস্বার্থতার অভাব।

১০। ধর্ম্মগত মত-সহিষ্ণুতার অভাব।

১১। ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তৃতির দিকে অমনোযোগ।

সমস্ত ভারতবর্ষ একতাসূত্রে বদ্ধ হইতে পারে নাই, ভিন্ন ভিন্ন জাতিও লোকের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মিলন হয় নাই, এবং দেশে অর্থ ও প্রতিভার উদ্ভব হয় নাই, ইহার কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত কারণ গুলিই তাহার মধ্যে প্রধান।

যে সমস্ত দেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের উন্নতির নিম্নলিখিত কারণ গুলি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১। কি করিলে দেশের উন্নতি হইবে, তাহার পরিষ্কার উপলব্ধি এবং দেশের সাধারণ লোকের সম্পদ ও জাতীয় অর্থ বৃদ্ধির নিরন্তর চেষ্টা।

২। যাহাতে দেশের উন্নতি ও মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহার সাধনে ব্যক্তি-গত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত বিরোধের বিস্মৃতি।

৩। বিচারালয় সমূহের সুব্যবস্থা এবং সকলেই যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সুবিচার পায় তাহার ব্যবস্থা।

৪। প্রজাগণ যাহাতে রাজভক্ত থাকে, তাহার বিশেষ চেষ্টা।

৫। স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যা বিস্তার ও ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের যাহাতে সুশিক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা।

৬। দেশের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষে পূর্ব্বোক্ত বিধানগুলি একে-বারেই ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতে একতা ছিল না।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে সমস্ত অভাব ছিল, তাহার অনেক অভাবই ইংরাজ রাজত্বে দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এ কথা বলিতেই হইবে যে, একতা বিষয়ে এখনও ভারতবর্ষে বিশেষ তেমন উন্নতি হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপে হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের কথা উল্লিখিত হইতে পারে। এই উভয় সম্প্রদায় বহু শতাব্দী ধরিয়া একই দেশে একই অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছে, সুতরাং এতদিনে তাহাদের মধ্যে ঠিক ভ্রাতার মত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই, এতদপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই তীব্র বিরোধ যতদিন চলিবে, ততদিন দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হওয়া অসম্ভব।

এই স্থলে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সহরে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ যত অধিক, সুদূরবর্ত্তী পল্লীগ্রাম মধ্যে তত নহে। দক্ষিণাপথের সুদূর পল্লীবাসী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নাই, বরং তাহাদের রীতি নীতি ভাষা ও উৎসব প্রভৃতিতে আশ্চর্য্যরূপ সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, এই সমস্ত স্থানে দেশের শত্রু ষড়যন্ত্রকারীদের কোনও রূপ প্রভাব নাই।

ঈশ্বর এক ও তিনি সকলের, পৃথিবীতে প্রচারিত ধর্ম্মমত সমূহের মধ্যে অবশ্য

প্রভেদ আছে, কারণ ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ যে আলোকে সনাতন সত্য সমূহকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই আলোক ভিন্ন, কিন্তু সকল ধর্ম্মই এক মূল প্রস্রবণ হইতে আগত, হিন্দু ও মুসলমানগণ এই কয়েকটি কথা উত্তমরূপে বুঝিলে আর বিরোধ থাকিবে না।

ইংরাজের সুশাসনে সকলেই নিজ নিজ অধিকার রক্ষা করিতে তুল্যরূপে সক্ষম, সুতরাং এখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুতা স্থাপিত হওয়া উচিত।

নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বন করিলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

১। পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্ত্তন ও ব্যয়বহুল মোকদ্দমা প্রভৃতি নিবারণ।

২। শিক্ষা-পদ্ধতিকে সুবিবেচিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশ মধ্যে শিক্ষা বিস্তার।

৩। শাসক ও শাসিত এই উভয় সম্প্রদায় যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

৪। উত্তেজনাজনক দোষাবহ ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যাহা যথার্থ অভাব ও অভিযোগ তজ্জন্ত আবেদন। অবশ্য যে অভাবের জন্ত আবেদন করিতেছি, সেই অভাব যথার্থ কি কাল্পনিক তাহা পূর্ব্বে নির্ণয় করা উচিত।

৫। বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষে ও রোগে সহস্র সহস্র নরনারী অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে—তাহা নিবারণের জন্ত সমবেত চেষ্টা।

শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য।

(আলোচনা)

ভারতী।—জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮। "বিবাহ" গল্প শ্রদ্ধেয় সম্পাদিকা কর্ত্তৃক লিখিত। বৈশাখ সংখ্যায় ইহার অর্দ্ধাংশ বাহির হইয়াছিল—বর্ত্তমান সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। গল্পটি উপাদেয়, ব্যঞ্জনা-বহুল ও সময়োপযোগী। নিরীহ কলেজের ছাত্র, সপ্তাহান্তে শৈশবের প্রিয় সঙ্গিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, আনন্দ উত্তেজনায় দিন কাটিতেছে, নির্ম্মম অদৃষ্টের বিধান, সহসা স্বদেশী হাঙ্গামায় পুলিশ তাহাকে ধরিল; পুলিশের হস্ত ও হাজত বাস হইতে যে দিন

সুকুমার নিস্কৃতি পাইয়া বাহিরে আসিল তাহার ঠিক পূর্ব্বেই তাহার পাত্রীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অদৃষ্টের খেয়াল এই ক্ষুদ্র গল্পে অতি নিপুণ ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের রাজকীয় ন্যায় বিচারের উপর অটল বিশ্বাস সামান্য রেখাপাতে অতীব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বৈশাখ সংখ্যায় এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় গল্পটি রাখা হইয়াছে যে পাঠক পর সংখ্যায় তাহার সমাপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবেন। পত্রিকাচালনায় ইহা একটি ন্যায্য কৌশল সন্দেহ নাই। 'কোম্পানীর দেওয়ানি' ঐতিহাসিক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার লিখিত, বিষয়-গৌরবে মূল্যবান হইলেও সুলিখিত নহে। লেখক বড় বড় ঘটনাগুলি এমন ব্যস্ত ভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে সাধারণ পাঠক বর্ণনীয় বিষয়ের একটা চিত্র গড়িয়া তুলিতে পারিবেন না সুতরাং ঘটনার বর্ণনা হিসাবে প্রবন্ধটি নিস্ফল—যাহারা এই ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত পরিচিত তাঁহারাও এই প্রবন্ধ পড়িয়া বিশেষ কিছু পাইবেন না কারণ কোনওরূপ গভীর বা উন্নত দার্শনিক তথ্যের নিস্কাসনে লেখক চেষ্টা করেন নাই। 'ধাতব পদার্থের তাড়িত বিশ্লেষণ' শ্রীশরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত। যাঁহারা ইংরাজীতে পদার্থবিজ্ঞান পড়িয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত প্রবন্ধটি অপরে ধৈর্য্য ধরিয়া পাঠ করিতে পারিবেন না। সাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিবার যে রীতি ইউরোপে অবলম্বিত হয় লেখক সেই রীতি অবলম্বন করিলে ভাল করিতেন। প্রথম কতকগুলি সামান্য বা বিশেষ আবিষ্কার ফল ও প্রাকৃতিক ঘটনা উল্লেখ পূর্ব্বক পাঠকের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা উদ্রিক্ত করার পর ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক বিধিগুলির আলোচনা করাই এ প্রকারের প্রবন্ধ রচনার পদ্ধতি। 'বিয়ে বাড়ী'—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী—অতি সুন্দর ও উপাদেয় প্রবন্ধ, পল্লীগ্রামের জঙ্গলমধ্যে অবস্থিত সুবৃহৎ ভগ্ন-অট্টালিকায় বিবাহের উৎসব—গায়ে হলুদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের আনুপূর্ব্বিক অনুষ্ঠানগুলির যথাযথ বর্ণনা। বেহারাদের সহিত গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের কলহ, পাঁড়াগায়ের বরযাত্রদের ব্যবস্থা অতি সুন্দর ও অতি নিপুণ ভাবে চিত্রিত। এমন চিত্র বঙ্গ-সাহিত্যে খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের স্ত্রী আচারের সময় একটি বালিকা বিধবার চিত্র অল্প কথায় কি হৃদয়-স্পর্শীই হইয়াছে! আমরা এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। 'বর্ষশেষ' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন আশ্রমে বর্ষশেষে উপাসনায় কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম। জীবনের একদিকে আরম্ভ অন্তদিকে

শেষ, একদিকে সঞ্চয় অন্যদিকে ব্যয়, একদিকে বৈচিত্র্য অপরদিকে একত্ব, একদিকে নেওয়া ও খাওয়া আর একদিকে খাজনা শোধ করা, একদিকে পূর্ব্বাচল আর একদিকে অস্তাচল, একদিকে শিশু আর একদিকে বৃদ্ধ। সাধক কবি তাঁহার যোগ দৃষ্টির সহায়ে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এ দুইটি দিক বিরোধী নহে সমারম্ভ ও সমাপ্তি একই পাতার দুইটি পৃষ্ঠা—একটি অখণ্ড মণ্ডলের মধ্যে তাহারা পরিপূর্ণ, শেষ শূন্যতায় নহে কবি ক্ষয়ের মধ্যেই অক্ষয় পূর্ণতা দেখিতেছেন। 'সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্চে সেখানে দেখচি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব।' যেখানে জন্মমরণ এক নিঃশব্দ সঙ্গীতে বিলীন 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ—বর্ষশেষের দিনে কবি আমাদের সেই দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"খেলা শেষ হয়, কিন্তু হে আমার জীবন খেলার সাথী তোমার ত শেষ হয় না। ধুলার ঘর ধুলায় মেশে, মাটির খেলেনা একে একে সমস্ত ভেঙে যায়, কিন্তু যে তুমি আমাকে এই খেলা খেলিয়েছ, যে তুমি এই খেলা আমার কাছে প্রিয় করে তুলেছ সেই তুমি খেলার আরম্ভে ও যেমন ছিলে খেলার শেষেও তেমনি আছ। খেলায় খুব করে মেতেছিলুম, তখন খেলাই আমার কাছে খেলার সঙ্গীর চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছিল তখন তোমাকে তেমন করে দেখা হয় নি। আজ যখন একটা খেলা শেষ হয়ে গেছে তখন তোমাকে ধরেছি, তোমাকে চিনেছি।"

'রাজকন্যা' নাটক সম্পাদিকা কর্ত্তৃক লিখিত। ক্রমশঃ প্রকাশ্য। 'প্রতিষ্ঠা লাভ' গল্প শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত লিখিত। কৌশলই সাহিত্যে নাম করিবার উপায়, ক্ষমতা নহে, ইহাই প্রতিপাদ্য। গল্পটি সুপাঠ্য ও সময়োপযোগী। 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি' শ্রীঅসিতকুমার হালদার লিখিত। উপসংহারে অবনীন্দ্র বাবুর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। অবনীন্দ্র-নাথ ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ রীতির প্রবর্ত্তক। প্রথমে তিনি একজন ইংরেজ শিল্পীর নিকট পাশ্চাত্য শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন পরে ১৩০৫ সালে মোগল যুগের এক চিত্র পুস্তক দেখিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ হ্যাভেল সাহেব ও এই সময়ে শিল্প বিদ্যালয়ে ভারতীয় বিভাগ খোলেন ও অবনীন্দ্র বাবু এই বিভাগে শিল্পগুরু হয়েন। নন্দলাল বসু, ৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মহিশূরের খ্যাত চিত্র শিল্পী ভেঙ্কাটাপ্পা প্রভৃতি অবনীন্দ্র বাবুর শিষ্য। হ্যাভেল সাহেব ও ডাক্তার কুমারস্বামী রবিবর্ম্মার তুলনায় অবনীন্দ্রনাথকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যেও যশস্বী তিনি বঙ্গসাহিত্যে পুরাতন কথকতা

তারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অবনীন্দ্র বাবুর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৩৯ বৎসর মাত্র। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুপুত্র শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র। লেখক এই প্রবন্ধে যদি অবনীন্দ্র বাবু শিল্পাদর্শের বিশেষত্ব বিশ্লেষণে সামান্ত চেষ্টাও করিতেন তাহা হইলে প্রবন্ধটি আর ও ভাল হইত। আমাদের আর একটি কথা বলিবার আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে Fine Arts কথাটার অনুবাদে সুকুমার কলা, ললিত কলা প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়। নূতন নূতন শব্দের দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় কিন্তু ইহার একটি সংস্কৃত শব্দ আছে তাহার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। শব্দটি "দেবজন বিদ্যা" ছান্দোগ্য উপনিষদের টীকায় শঙ্কর ইহার অর্থ দিয়াছেন "নৃত-গীত বাদ্য শিল্পাদি বিজ্ঞানানি।" 'ভারতী'র চয়নও' বেশ প্রশংসনীয়; হিউয়েন সাংএর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সিউ-ইউ-কি অনূদিত হইতেছে। 'লীলার কাহিনী' ও 'মাতৃঋণ' নাম দিয়া দুখানি উপন্যাস শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত হইতেছে। অনুবাদ সুন্দর, উপন্যাস দুখানি ও সুনির্ব্বাচিত। 'মৃত্যুর পরেও আণবিক জীবন' ও 'প্রাচীন নগর ভারহাট' চয়নের আর দুইটি প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে অধ্যপক ক্যারেল ও বারোজ চিকিৎসা জগতে ক্রিয়াশীল জীবনও প্রচ্ছন্ন জীবন এই দ্বিবিধ জীবন তত্ত্ব প্রচার করিয়া যে যুগান্তরআনয়ন করিয়াছেন তাহাই আলোচিত হইয়াছে। এই চিকিৎসা চলিলে মানুষের শরীরের একটা যন্ত্র খারাপ হইলে ঘড়ির কলের মত সেই যন্ত্রটি বাদ দিয়া তাহার স্থানে আর একটি যন্ত্র বসাইয়া দিতে পারা যাইবে। এজন্য অন্যান্য জীবদেহ হইতে পূর্ব্ব হইতে যন্ত্র সংগ্রহ করিয়া 'জীয়াইয়া' রাখিতে হইবে। 'দ্বিতীয় প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় এই। ভারহাটের প্রাচীন নাম 'বরদাবতী' পূর্ব্বে ইহা শুঙ্গ রাজ্যের একটি অতি প্রধান নগর ছিল। এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর অভিমুখে যে রেল লাইন গিয়াছে তাহাতে উচ্হারা' নামে একটি নগর আছে—সেখান হইতে ভারহাট ছয় মাইল। ইহা নাগোর রাজ্যের অন্তর্গত। নিবিড় জঙ্গল মধ্যে অবস্থান হেতু বহুকাল লোকে এই নগরের কথা জানিত না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব ইহার অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হন। এই নগর খনন করিয়া অনেক মূর্ত্তি, শিলালিপি, স্তম্ভ, তোরণ, মুদ্রাস্ত্র, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, দিগদর্শন যন্ত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে। 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস' শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত ক্রমশঃ প্রকাশ্য। অবনীন্দ্র বাবুর শিষ্য ভেঙ্কটাপ্পা কৃত 'মহাভারত লিখন' নামক

ত্রিবর্ণ চিত্র ভারতীর প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সংখ্যায় অবনীন্দ্র বাবুর দু একখানি প্রধান চিত্র দিলে বেশ প্রাসঙ্গিক হইত। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের যে উন্নতি হইয়াছে ভারতী তাহার একতম প্রমাণ।

প্রবাসী।—জ্যৈষ্ঠ্য ১৩১৮। 'গীতা-পাঠের ভূমিকা' শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত। যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে কিছুদিন চলিবে বলিয়াই মনে হয়। এই প্রবন্ধের দ্বারা অনেকেই উপকৃত হইবেন। কয়েক সংখ্যা পরে আমরা পৃথক ভাবে ইহার অলোচনা করিব। কেবল বিনীত ভাবে দুইটি কথা বলিবার আছে। 'অন্ধং তমঃ' আদি শ্লোক কঠোপানিষদের নহে, ঈশোপানিষদের, দুই স্থানেই ভুল হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনে 'ঈশ্বর প্রণি-ধান'কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পথ বলা হইয়াছে কি না বিশেষ সন্দেহ। "বা" শব্দের অর্থ—বিকল্প। "জীবন বৈচিত্র্য" শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ প্রবীণ লেখক তাঁহার ভবিষ্যতের জীবন চরিতাখ্যায়কের জন্য কিছু কিছু উপকরণ ও দিয়া যাইতেছেন। রবিন্দ্রনাথের 'নববর্ষ'—প্রকৃতিরাজ্যে পুরাতনের আবরণ হইতে নূতনের মুক্তিলাভ অনায়াসেই হয়—মানুষ তাহার নিজের 'রুচি বিশ্বাস মতা-মতের দ্বারা সীমাবদ্ধ জগতে 'আপনার শত সহস্র সংস্কারের দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে আবদ্ধ'—'তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা—এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়। 'তরু-লতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ'। "সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ কর্‌বে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।" "হে রুদ্র···তোমার প্রলয়-লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিন বলে আঘাত করুক, তা হলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব আনন্দ-সঙ্গীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে।" 'অশোকষষ্ঠী' পল্লীচিত্র, সুন্দর ও যথাযথ—আমরা এই উপাদেয় প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। 'ব্রত কথা' স্ত্রীলো-কেরা যেরূপ মনোরমভাবে বলিয়া থাকেন এই প্রবন্ধেও ব্রত কথাটি ঠিক তেমনি হইয়াছে। কেবল দু এক স্থানে একটু কঠোর লাগিয়াছে—যেমন 'রাজা বর্দ্ধিত ঘৃণায় বল্‌লেন'—'প্রাসাদ থেকে দূর করে দাও'। এই স্থলগুলি দেখিলে এই প্রকারের প্রবন্ধ বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরবের বিষয় হইবে। 'নির্ব্বাণ' —শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ—প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ আমরা শেষ হইলে আলোচনা করিব। 'মানুষের জাতিবর্ণ' সচিত্র প্রবন্ধ লণ্ডন ম্যাগাজিন হইতে।

শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংউটান্ ও গিবন মানুষের জাতি। 'মামাভাগ্নী'—গল্প ইংরাজী হইতে—বেশ সুপাঠ্য ও হাস্যরসাত্মক—শ্রীমতী মাধুরীলতা দেবী কর্ত্তৃক লিখিত। 'প্রাচীন ভারতের সভ্যতা' বিলাতী মতের প্রতিধ্বনি—বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে যাহা পাওয়া যায় তাহার অতিরিক্ত কিছু নাই। লেখক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সতীশ' গল্প—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত—বেশ গল্প—মূর্খস্বামী পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি বৃথা সন্দেহ করিয়াছিলেন—যাহা হউক সদ্বন্ধুর সাহায্যে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। 'মহাকর্ষণ' নিপুণ বৈজ্ঞানিক রচনা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত। "দেশীয় কল" শীর্ষক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের রচনা। এই প্রবন্ধটি অতীব শিক্ষাপ্রদ, আগাগোড়া কাজের কথায় পূর্ণ। বহুদর্শী ও সুপণ্ডিত লেখক মহাশয় ঢেঁকি, চড়কা, তাঁত, ঘানি, ভূমি সেচনার্থ পঞ্জাবে ব্যবহৃত রহট্ প্রভৃতি যন্ত্র বর্ণনা করিয়া দেখাইতেছেন "দেশীয় কলের এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতেছি, কল কাঠ হইতে লোহাতে আসে নাই। মানুষ ছাড়িয়া কদাচিৎ গরুর শক্তিতে পঁহুছিয়াছে। অর্থাৎ চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপে কলের যে অবস্থা সেই অবস্থা চলিতেছে।" আমাদের দেশে নদীস্রোত আছে, প্রচণ্ড রৌদ্রকর আছে, এখন চাই বৈজ্ঞানিক যিনি এই সমস্তকে কাজে লাগাইতে পারেন। এই প্রকারের প্রবন্ধ যতই প্রচারিত ও আলোচিত হইবে ততই মঙ্গল। 'বাজিপ্রভু দেশ পাণ্ডে' সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থে এই সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র—বীরের নাম দেখা যায় না এবং ইঁহার নাম সকলের নিকট্ তত পরিচিতও নহে। এই মহাবীর রঙ্গণের গিরিবর্ত্মে নিজের জীবন দিয়া শিবাজীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি মূল্যবান, লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন। 'আসামের আবর জাতি' সচিত্র প্রবন্ধ সময়োপযোগী ও সুপাঠ্য। 'আয়ারপাটা' নৈনিতালের সন্নিকটবর্ত্তী—হিমালয় প্রদেশের বর্ণনা—লেখক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রবন্ধটি বেশ উপভোগ্য। জন্মদুঃখী—উপন্যাস—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। ভাষা ভাল, গল্পও ভাল। আমাদের একটি বিনীত নিবেদন আছে, বৈদেশিক উপন্যাস অনুবাদ করিলে সেখানি কোন্ গ্রন্থের অনুবাদ তাহা বলিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। অনুবাদ সাহিত্যের পুষ্টির জন্য দরকার, আবার এই অনুবাদ কার্য্যে অনেকেই আছেন, সুতরাং কোন্ কোন্ গ্রন্থ অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে তাহার হিসাব রাখা প্রয়োজন। 'নবীন সন্ন্যাসী' এবার একত্রিংশ অধ্যায় বাহির হইল। মাসিক পত্রিকার সমালোচনার শিরোদেশে

'কষ্টি পাথর' আর নিয়ে 'করেন্সির কাঁচি, এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত বালকোচিত হইয়াছে। আশা করিয়া সমালোচনা কার্য্যের গুরুত্ব অনুধ্যান করিয়া এই দুইটি শব্দ পরিত্যক্ত হইবে। 'বেদব্যাখ্যা পদ্ধতি' শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক লিখিত ঋগ্বেদের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া অনেক কে উপহাস ও গালি দিয়া লইয়াছেন।

কোহিনূর।—বৈশাখ ১৩১৮। নব-পর্য্যায় ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। আমরা এই নূতন মুসলমান ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত মাসিক পত্রখানি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। 'নির্ভর' কবিতা শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত লিখিত বেশ সুপাঠ্য। "মহর্ষি নেজাম উদ্দীন" সেখ আবদুল জব্বর কর্ত্তৃক লিখিত এই মহর্ষির জীবনী একেবারে মহর্ষি বাল্মীকির জীবনীর অনুরূপ। "প্রাচীন ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা" শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ চট্টগ্রামের অন্তর্গত ফতেয়াবাদের সুপ্রসিদ্ধ কবি "আলাওলের দীঘি"র পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত এক মস্‌জিদ বক্ষে এক শিলাখণ্ড স্থাপিত আছে। তাহা পাঠে জানা যায় যে এই মস্‌জিদ ১৪৫৯—৬০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মামুদ সাহের পুত্র বাঙ্গলার সুলতান বরবক সাহের শাসনকালে নির্ম্মিত হয়। রাস্তি খাঁ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই রাস্তি খাঁ বঙ্গ সাহিত্যে বিখ্যাত হুসেন সাহার সেনাপতি পরাগল খাঁর পিতা। পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ এই উভয়ের বাহুবলে সুলতান নাছিরদ্দিন নছরথ সাহ ত্রিপুরাধিপতি দেবমাণিক্যকে পরাস্ত করিয়া চটগ্রাম অধিকার করেন। মিরেশ্বরী থানার মধ্যে, ফেণীতীরে এখনও 'পরাগলপুর' নামক গ্রাম আছে—তথায় প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও দীর্ঘিকা আছে। 'দুর্যোগ' গল্প—শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত—ক্রমশঃ প্রকাশ্য। হিন্দু ও মুসলমান বালকের গভীর বন্ধুতায় গল্পের আরম্ভ বেশ সুলিখিত। 'আরব জাতির ইতিহাস' জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। "ঐতিহাসিক সংগ্রহের মধ্যে আবদুল করিম সাহেব দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর সাহের কনিষ্ঠ পুত্রের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ইনি সিপাহী বিদ্রোহের পর ফকির আবদুল্লা সাহ এই নাম লইয়া রাজপুতানার কোটারাজ্যে কয়েক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। 'রত্ন চয়ন' প্রবন্ধে বিবিধ পারস্যগ্রন্থের সুন্দর উপদেশ সংগৃহীত হইতেছে। আমরা এই পত্রের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 'কবিতা গুচ্ছ' এর কবিতাগুলি বেশ। জনৈক মুসলমান মহিলা কর্ত্তৃক লিখিত 'আহ্বান গীতি' বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য-সেবক

বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের

বর্ণানুক্রমিক

সচিত্র চরিতাভিধান।

শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত।

সিউড়ি, বীরভূম, এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

সুদীর্ঘ ভূমিকা ও বিশদ পরিশিষ্ট সমেত প্রাচীন ও অধুনা পরলোকগত যাবতীয় (চতুর্দ্দশ শতাধিক) বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের সুন্দর হাফ্‌-টোন চিত্র সম্বলিত বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ডিঃ ৮ পেজী, ৫ ফর্ম্মা বা ৪০ পৃঃ আকারে অনুমান ২০ খণ্ডে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে। ছাপা, কাগজ ও চিত্র সুন্দর। কি সুধীসমাজ, কি সংবাদ পত্র, সর্ব্বত্রই বহুল প্রশংসিত। ১১শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; অবশিষ্ট খণ্ডগুলি যন্ত্রস্থ—অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৪॥০ টাকা; পরে মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

১ম বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৮। [৯ম সংখ্যা।

(নবপর্য্যায়)

সম্পাদক

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ।

বীরভূম-সাহিত্য-পরিষৎ।

বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকগণ।

১৩১৭।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমার রামেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর।

সহ-সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত কুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, হেতমপুর; শ্রীযুক্ত নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর; শ্রীযুক্ত কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায় বি, এল, সরকারী উকীল, সিউড়ি; শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, সিউড়ি; শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, সুলতানপুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মিশ্র বি, এল, উকীল।

সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, সব ডেপুটী কালেক্টর, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র; শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ (মাসিক পত্রের সম্পাদক)

ধন রক্ষক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, জমিদার ও উকিল সিউড়ি;

গ্রন্থ রক্ষক—শ্রীযুক্ত শিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল।

আয় ব্যয় পরীক্ষকগণ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভৌমিক এম, এ, বি, এল, উকীল; শ্রীযুক্ত লালা মৃত্যুঞ্জয় লাল বি, এল, উকীল।

ছাত্র-সভ্য পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

পুঁথি সংগ্রাহক ও মাসিক পত্রের এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়।

এতদতিরিক্ত নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য—

শ্রীযুক্ত যুগলবিহারী মাকড় এম, এ, বি, এল, উকীল, রামপুরহাট; শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু এম, এ, বি, এল, উকীল, বোলপুর; শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ বি, এল, উকীল বোলপুর; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল, দুবরাজপুর; শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন চৌধুরী বি, এল, সিউড়ি, শ্রীযুক্ত চারুশশী চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস্, সিউড়ি; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী 'বীরভূমবার্ত্তা'র সম্পাদক সিউড়ি; খান বাহাদুর মৌলভী সামসুজ্জোহা বি, এ, জমিদার, সেকেড্ডা; শ্রীযুক্ত রাধাহরি সেন জমিদার, করিধা; শ্রীযুক্ত ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরন্দরপুর।

"বীরভূমি"র নিয়মাবলী।

১। "বীরভূমি" বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র।

২। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।৹ চারি আনা। পরিষদের সভ্যগণ ইহা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

৩। প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে "বীরভূমি" নিয়মিতভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহা মাসিক এক সহস্র করিয়া মুদ্রিত হয়।

৪। অশ্লীল ও অসত্যমূলক বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৫। প্রবন্ধাদি পত্রিকা সম্পাদকের নামে ও টাকা কড়ি বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

৬। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট না পাঠাইলে ফেরত দেওয়া হয় না। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা প্রবন্ধ গৃহীত হয় না।

শ্রীশিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এল।
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ, সিউড়ি, বীরভূম।

সূচীপত্র।

(১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩১৮)

(নবপর্য্যায়)

১ম বর্ষ। | শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

সিদ্ধি।

জাগাও, জাগাও আত্মার যত সূক্ষ্ম নিভৃত বল ;
ভুলোনা, ভুলোনা জীবন-লক্ষ্য, রাখিও ধ্রুব অটল ;
ঘটনার স্রোত যেন না ফিরায় তব ভাগ্যের গতি,—
ঘটনাবলির অধিরাজ তুমি,—তুমি ভাগ্যের পতি,—
পোষ অন্তরে এ মহাসত্য, প্রত্যয়ে ভরি প্রাণ,
ভয়, সংশয়, ভ্রান্তি ঘুচিবে, সিদ্ধি লভিবে স্থান !
কে তুমি তা জান ?—ঐশী শক্তি নিবসে তোমার মাঝে,
তোমাতে ভূমার বিভূতি মহিমা শ্বেত প্রতিভায় রাজে !
প্রপঞ্চে তব করি বশানুগ, ঘোষ আত্মার জয়,
শক্তি-জ্ঞানেতে মুক্তি লভিয়া শান্তিতে হও লয়।
প্রেমে জড়ায়ে বিশ্ব শরীর আপন করিয়া রাখ,
দ্বেষ বিজয়ে দিগ্বিজয়ের তৃপ্তিতে সুখে থাক !
মঙ্গলালয় বিশ্বে যা কিছু, তব সনে সুর বাঁধা
হউক কার্য্য চিন্তা তোমার, সংগীত সম সাধা ;
মহা নীরবতা হতে যেই বাণী মর্ম্মের মাঝে পশে,
থাক্ জাগ্রত আগ্রহ ভরা শ্রোত্র তাহার বশে।
অহো, আনন্দ !—রাজ-নন্দন, বুঝ নিজ অধিকার,
আনন্দ তব নিশ্বাস-বায়ু, হৃদে আনন্দ সার,
আত্মার বলে বলীয়ান্ হয়ে অমৃত সুখেতে রহ ;
ইঙ্গিতে জড় ভৃত্যের সম রহিবে আজ্ঞাবহ !

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সফলতা।

কে না জানে এই পৃথিবী নশ্বর? কে না জানে সকলই ফুরাইয়া যাই সকলই ভাঙ্গিয়া যাইবে, আজ যাহা আছে কাল আর তাহা থাকিবে না? জীবন-পথে পর্য্যটন-কারী কোন্ সৌভাগ্যবান মানবসন্তান সে, যে এক অতি তীব্র বেদনার আগুণে দগ্ধ হইতে হইতে পরিষ্কার রূপে অনুভব ক নাই, এই পৃথিবীর সুখ ও হাসি, উল্লাস ও প্রেম, নিতান্ত ক্ষণ স্থায়ী? 'আশ ছলনে ভুলি' কে না গাহিয়াছে তাহারা 'ক্ষণ প্রভা-প্রভা মত বাড়ায় ম আঁধার পথিকে ধাঁধিতে'? নিরাশার তপ্ত অশ্রু কাহার না বক্ষ ভাসাইয়া অতৃপ্তির চিতানল কাহার না হৃদয় সৈকতে জ্বলিয়াছে?

মানব মূঢ় হউক, অলস হউক, ভোগপরায়ণ হউক, সে বোঝে, জানে। কিন্তু জানিনা সে মহতী শক্তি কি, যাহার প্রভাবে মানব জানিয় জানে না, বুঝিয়াও বুঝে না, অধিক কি জানিয়াও, চেষ্টা করিয়া ভুলিয়া যা বার জন্য ব্যাকুল হয়! কে বক্ষে হাত দিয়া দৃঢ় ভাবে বলিতে পারে সংস কিছুই নয়, কে বলিতে পারে, এই সংসারে আকাঙ্ক্ষা করিবার, উপার্জ্জ করিবার, ভোগ করিবার, অধিকার করিবার ও দেখাইবার কিছুই নাই? যি বলিতে পারেন তিনি মহাপুরুষ, তাঁহার চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করি কিন্তু আমাদের মত কোটি কোটি দুর্ব্বলচিত্ত মানব সত্যের প্রতি তাকাই এরূপ কথা বলিতে পারিল না, জানিয়া শুনিয়াও স্বীকার করিল না সংসা কিছুই নহে।

তাই আমরা ছুটিয়াছি; সংসারের মধুরোজ্জ্বল মূর্ত্তি আমাদের ভুলাইয়াছে আমরা সংসারকে পাইবার জন্য, তাহার বিচিত্র ভাব ও রসের মধ্য দিয় তাহাকে উপভোগ করিবার জন্য, আমরা দলে দলে ছুটিয়াছি। হয়ত, মূঢ় পতঙ্গ যে উজ্জ্বল আলোক শিখা দেখিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া জ্বলিয় মরিবার জন্য ছুটিয়াছে, আমরাও ঠিক তাহারই মত। হয়ত, মরুভূমির পথি কের মত তৃষ্ণাময় ভীষণ মৃত্যুর কবলগত হইবার জন্য আমরা মরীচিকার অনুবর্ত্তন করিতেছি—আবার হইতে পারে আমরা তাহাদের অপেক্ষাও অজ্ঞান, তাহাদের অপেক্ষাও মূঢ়; কিন্তু সে কথা ভাবিয়া লাভ নাই; অনেক শিক্ষা পাইয়াছি, অনেক উপদেশ শুনিয়াছি—কিন্তু কৈ এই কোটি কোটি মানব সন্তানের দুর্নিবার গতির স্রোত মুহূর্ত্তের জন্যও রুদ্ধ হইল না?

আমরা যে সংসারের। হোক্ তাহা নিন্দার কথা, হোক্ তাহা লজ্জার কথা, হোক্ তাহা পাপ বা অজ্ঞানতার কথা, তথাপি বলিব আমরা সংসারের —সত্যের অপলাপ করিব না, নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়া আত্মবঞ্চনা করিব না, যতক্ষণ 'অপণ্ডিত' ততক্ষণ মুখে 'প্রজ্ঞাবাদ' বলিব না। সংসার আমাদের ভুলাইয়াছে,—মুগ্ধ করিয়াছে, সহস্র বন্ধনে আপনার সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছে। সংসারে আমাদের প্রয়োজন আছে, কামনা আছে, তাই আমরা এখানে আছি। হয়ত আরও অনেকবার ইহার পূর্ব্বে আসিয়াছি, হয়ত এবারেও বুঝি প্রয়োজন ফুরাইবেনা, হয়ত আবার আসিব, একবার নহে দুইবার নহে শত শতবারও হয়ত আসিতে হইবে—জানিনা সত্য কি, কিন্তু অবিশ্বাস করিব কেন? আমরা যে একান্ত ভাবে সংসারের, এই খানেই আমাদের মন বাঁধা রহিয়াছে, এইখানেই আমাদের স্বর্গ, এই খানেই আমাদের পরমার্থ, আর কিছু যে আমরা দেখিতে পাইলাম না! যে দিন এ মস্তক মরণের অঞ্চল ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িবে, সে দিন বুঝি এই নিস্তেজ নয়ন দুইটি এই সংসারের পানে চাহিয়া তপ্ত অশ্রু মোচন করিতে করিতে, অতৃপ্তির শেষ দীর্ঘশ্বাসের সহিত চির নিমীলিত হইবে। আমরা যে সংসারকে ভালবাসি—হৃদয়ের সহিত ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি—তাই আমরা দিনের পর দিন, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, এই সংসারকে লইয়া কল্পনা করিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি।

মানব জাতির ইতিহাসের এই একটা সর্ব্বজন পরিচিত বৃহৎ অধ্যায়। কিন্তু এই মানব জাতির বিরাট ইতিহাস কি এই খানেই শেষ? ইহা ছাড়া মানবের ইতিহাসে কি অন্য কথা কিছু নাই? মানব জাতি কি এমন লোক দেখে নাই যাহারা এই জগতে আসিয়াছেন কিন্তু এই জগতের কোনও বস্তু তাঁহাদের চিত্তে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারে নাই? এমন কাহারও কথা কি মানবের ইতিহাসে নাই, যাঁহারা এই সংসারে বাস করিয়াছেন, অতন্দ্রিত ভাবে সর্ব্বদাই খাটিয়াছেন অথচ এই সংসারের এমন কোন বস্তু নাই যাহা পাইবার জন্য, যাহা ভোগ করিবার জন্য, এক মুহূর্ত্তও তাঁহারা লোলুপ হইয়াছেন? মানব জাতি কি এমন কাহারও পরিচয় পায় নাই যাঁহারা এই সংসারের উর্দ্ধে অবস্থিত কোনও শাশ্বত চিন্ময় ধামের বার্ত্তা লইয়া এই জগতে আসিয়াছিলেন, নিজের কোন প্রয়োজন জন্য আসেন নাই, কেবল মাত্র এই মূঢ় ও রোরুদ্যমান মানব সন্তানগণকে এই সংসারের রুদ্ধ ও পূতিগন্ধময় বায়ু-

সফলতা।

কে না জানে এই পৃথিবী নশ্বর? কে না জানে সকলই ফুরাইয়া যাইবে সকলই ভাঙ্গিয়া যাইবে, আজ যাহা আছে কাল আর তাহা থাকিবে না? এই জীবন-পথে পর্য্যটন-কারী কোন্ সৌভাগ্যবান মানবসন্তান সে, যে এক দিন অতি তীব্র বেদনার আগুণে দগ্ধ হইতে হইতে পরিষ্কার রূপে অনুভব করে নাই, এই পৃথিবীর সুখ ও হাসি, উল্লাস ও প্রেম, নিতান্ত ক্ষণ স্থায়ী? 'আশার ছলনে ভুলি' কে না গাহিয়াছে তাহারা 'ক্ষণ প্রভা-প্রভা মত বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে'? নিরাশার তপ্ত অশ্রু কাহার না বক্ষ ভাসাইয়াছে, অতৃপ্তির চিতানল কাহার না হৃদয় সৈকতে জ্বলিয়াছে?

মানব মূঢ় হউক, অলস হউক, ভোগপরায়ণ হউক, সে বোঝে, সে জানে। কিন্তু জানিনা সে মহতী শক্তি কি, যাহার প্রভাবে মানব জানিয়াও জানে না, বুঝিয়াও বুঝে না, অধিক কি জানিয়াও, চেষ্টা করিয়া ভুলিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়! কে বক্ষে হাত দিয়া দৃঢ় ভাবে বলিতে পারে সংসার কিছুই নয়, কে বলিতে পারে, এই সংসারে আকাঙ্ক্ষা করিবার, উপার্জ্জন করিবার, ভোগ করিবার, অধিকার করিবার ও দেখাইবার কিছুই নাই? যিনি বলিতে পারেন তিনি মহাপুরুষ, তাঁহার চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করি। কিন্তু আমাদের মত কোটি কোটি দুর্ব্বলচিত্ত মানব সত্যের প্রতি তাকাইয়া এরূপ কথা বলিতে পারিল না, জানিয়া শুনিয়াও স্বীকার করিল না সংসার কিছুই নহে।

তাই আমরা ছুটিয়াছি; সংসারের মধুরোজ্জল মূর্ত্তি আমাদের ভুলাইয়াছে, আমরা সংসারকে পাইবার জন্য, তাহার বিচিত্র ভাব ও রসের মধ্য দিয়া তাহাকে উপভোগ করিবার জন্য, আমরা দলে দলে ছুটিয়াছি। হয়ত ঐ মূঢ় পতঙ্গ যে উজ্জল আলোক শিখা দেখিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া জ্বলিয়া মরিবার জন্য ছুটিয়াছে, আমরাও ঠিক তাহারই মত। হয়ত, মরুভূমির পথিকের মত তৃষ্ণাময় ভীষণ মৃত্যুর কবলগত হইবার জন্য আমরা মরীচিকার অনুবর্ত্তন করিতেছি—আবার হইতে পারে আমরা তাহাদের অপেক্ষাও অজ্ঞান, তাহাদের অপেক্ষাও মূঢ়; কিন্তু সে কথা ভাবিয়া লাভ নাই; অনেক শিক্ষা পাইয়াছি, অনেক উপদেশ শুনিয়াছি—কিন্তু কৈ এই কোটি কোটি মানব সন্তানের দুর্নিবার গতির স্রোত মুহূর্ত্তের জন্যও রুদ্ধ হইল না?

আমরা যে সংসারের। হোক্ তাহা নিন্দার কথা, হোক্ তাহা লজ্জার কথা, হোক্ তাহা পাপ বা অজ্ঞানতার কথা, তথাপি বলিব আমরা সংসারের —সত্যের অপলাপ করিব না, নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়া আত্মবঞ্চনা করিব না, যতক্ষণ 'অপণ্ডিত' ততক্ষণ মুখে 'প্রজ্ঞাবাদ' বলিব না। সংসার আমাদের ভুলাইয়াছে,—মুগ্ধ করিয়াছে, সহস্র বন্ধনে আপনার সহিত অবি- চ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছে। সংসারে আমাদের প্রয়োজন আছে, কামনা আছে, তাই আমরা এখানে আছি। হয়ত আরও অনেকবার ইহার পূর্ব্বে আসি- য়াছি, হয়ত এবারেও বুঝি প্রয়োজন ফুরাইবেনা, হয়ত আবার আসিব, একবার নহে দুইবার নহে শত শতবারও হয়ত আসিতে হইবে—জানিনা সত্য কি, কিন্তু অবিশ্বাস করিব কেন? আমরা যে একান্ত ভাবে সংসারের, এই খানেই আমাদের মন বাঁধা রহিয়াছে, এইখানেই আমাদের স্বর্গ, এই খানেই আমাদের পরমার্থ, আর কিছু যে আমরা দেখিতে পাইলাম না! যে দিন এ মস্তক মরণের অঙ্কশ ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িবে, সে দিন বুঝি এই নিস্তেজ নয়ন দুইটি এই সংসারের পানে চাহিয়া তপ্ত অশ্রু মোচন করিতে করিতে, অতৃপ্তির শেষ দীর্ঘশ্বাসের সহিত চির নিমীলিত হইবে। আমরা যে সংসারকে ভালবাসি—হৃদয়ের সহিত ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি—তাই আমরা দিনের পর দিন, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, এই সংসারকে লইয়া কল্পনা করিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি।

মানব জাতির ইতিহাসের এই একটা সর্ব্বজন পরিচিত বৃহৎ অধ্যায়। কিন্তু এই মানব জাতির বিরাট ইতিহাস কি এই খানেই শেষ? ইহা ছাড়া মানবের ইতিহাসে কি অন্য কথা কিছু নাই? মানব জাতি কি এমন লোক দেখে নাই যাহারা এই জগতে আসিয়াছেন কিন্তু এই জগতের কোনও বস্তু তাঁহাদের চিত্তে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারে নাই? এমন কাহারও কথা কি মানবের ইতিহাসে নাই, যাঁহারা এই সংসারে বাস করিয়াছেন, অতন্দ্রিত ভাবে সর্ব্বদাই খাটিয়াছেন অথচ এই সংসারের এমন কোন বস্তু নাই যাহা পাইবার জন্য, যাহা ভোগ করিবার জন্য, এক মুহূর্ত্তও তাঁহারা লোলুপ হইয়াছেন? মানব জাতি কি এমন কাহারও পরিচয় পায় নাই যাঁহারা এই সংসারের ঊর্দ্ধে অবস্থিত কোনও শাশ্বত চিন্ময় ধামের বার্ত্তা লইয়া এই জগতে আসিয়াছিলেন, নিজের কোন প্রয়োজন জন্য আসেন নাই, কেবল মাত্র এই মূঢ় ও রোরুদ্যমান মানব সন্তানগণকে এই সংসারের রুদ্ধ ও পূতিগন্ধময় বায়ু-

মণ্ডলের উর্দ্ধে কোন মুক্ত ও অমৃতগন্ধময় আলোক রাজ্যে তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন—মানব জাতির কর্ণে কি এমন কোনও মানবদেহধারীর কথা ধ্বনিত হয় নাই, যাঁহাকে জগৎ ঘৃণা করিয়াছে, তিরস্কার করিয়াছে, উৎপীড়ন করিয়াছে, বিনাশ করিয়াছে, অথচ তাঁহারা মানবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া শতবার অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াও নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে মানবকে তাহার নিজের মঙ্গলের কথাই বলিয়াছেন, যিনি পদাহত হইয়া সেবা করিয়াছেন, অপমানিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, নিহত হইয়াও উদ্ধার করিয়াছেন। এমন সব মহাপুরুষের কথা কি মানবের ইতিহাসে নাই? যাঁহারা আমাদের মত কামনার তাড়নায় নিজের অভাব মিটাইবার জন্য বাধ্য হইয়া নহে, কেবলমাত্র এই পতিত ও সন্তপ্ত শত শত নর নারীর কল্যাণ কামনায় স্বেচ্ছায় জগতে আসিয়াছিলেন—অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও এই রুদ্ধবায়ু ধূলিময় দেশে কেবল জগতের জন্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

কোথায় সেই সব মহাপুরুষগণ? কে তাঁহাদের সংখ্যা করিতে পারে? কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশে নহে, কোনও নির্দ্দিষ্ট ও বিধাতার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত জাতি বিশেষের মধ্যে নহে, কোনও দূরবর্ত্তী সুবর্ণময় আদর্শ পবিত্রতার যুগেও নহে, সকল দেশে, সকল যুগে সকল জাতির মধ্যে, সমাজ জীবনের সকল প্রকার অবস্থাকে ধন্য করিয়া, এই সব মহাপুরুষ আসিয়াছেন। কি চীন, কি প্রাচীন মিশর, কি ভারতবর্ষ, কি পারস্য, কি আরব, কি এসিয়া মাইনর, কেহই বঞ্চিত হয় নাই, কখনও রাজ-রাজেশ্বরের ছত্র দণ্ডমুকুটের মধ্যে, কখনও সন্ন্যাসীর জটা বল্কলের মধ্যে, কখনও দীন গৃহস্থের নিত্য অনুভূত অভাব রাশির মধ্যে মানব জাতি এই সমস্ত মহাপুরুষগণকে যে কত বার দেখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও কত জন হয়ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছেন, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? কে জানে আমাদেরই গৃহদ্বারে সেই মহাপুরুষ সম্প্রদায়ের একজন লোক অপ্রকট ভাবে বসিয়া নাই? হায়, আমরা তাঁহাদের কেমন করিয়া চিনিব, তাঁহারা যে আমাদের মত নহেন! জানিনা এই জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি তাঁহাদের সহিত আমাদের ব্যবধান বাড়াইতেছে কি কমাইতেছে? কিন্তু এ কথাটা সত্য যে মানব জাতি এই বহু বহু শতাব্দীর অনুশীলনের ফলেও তাঁহাদের যথার্থ ভাবে চিনিতে পারিল না।

আহা, এই মহাপুরুষ সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন

তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, আজ যাঁহারা আছেন, আমরা হয়ত তাঁহাদের চিনিব না, জগতে কত অসার লোক আদর পাইবে, পূজা পাইবে, কত চতুর পরার্থপরতার মেষচর্ম্মে নিজেদের স্বার্থপর ব্যাঘ্র-প্রকৃতি কৃতকার্য্যতার সহিত লুকাইয়া শত শত নিরীহ মানবের ভক্তি উপহার লইয়া যাইবে—কিন্তু তাঁহারা অজ্ঞাত ভাবে উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্যে জীবন কাটাইয়া চলিয়া যাইবেন—অবশ্য অভিমানে নহে, অভিশাপ দিতে দিতে নহে, প্রশান্ত মধুর হাস্যে আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে। আজ যাঁহারা আছেন কাল তাঁহারা চলিয়া যাইবেন। ভবিষ্যতে যাঁহারা আসিবেন আমরা বা আমাদের বংশধরেরা হয়ত তাঁহাদের প্রতিও এইরূপে ব্যবহার করিবে! হায়, তাঁহারা কি সত্যই একেবারে চলিয়া যাইতেছেন?

চাহিয়া দেখিলাম, অস্পষ্টতার মধ্যে আভাসে বুঝিলাম এক সুবৃহৎ অমৃত-হ্রদ—দূরে, অতিদূরে অবস্থিত। সেই সমস্ত মহাপুরুষদিগের সমগ্র জীবনের বিপুল ও কঠোর সাধনা দ্রব হইয়া, অমৃত হইয়া এই হ্রদের পুষ্টিসাধন করিতেছে—আমাদের এই পৃথিবী কখনই নীরস বা অনুর্ব্বর নহে, এখনও এই পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে কত শত ভাব ও রস, বাষ্পের মত উত্থিত হইতেছে, সেই অমৃত হ্রদে পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিন্দু বিন্দু করিয়া শক্তি সুধা সঞ্চিত হইতেছে অক্ষয় সে ভাণ্ডার! উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে এই অমৃত হ্রদ তাহার প্রাপ্য বলিয়াই মানব জাতি ধন্য, অন্য কারণে নহে।

চাহিয়া দেখিতেছি সেই অমৃত হ্রদের তীরে অনেক সাধক বসিয়া রহিয়াছেন, সেই অমৃতহ্রদ হইতে শক্তি সুধা আহরণ করিয়া তাঁহারা রোরুদ্যমান মানব সন্তানগণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। ভাগ্যবান সেই মানব, যাঁহার পিপাসাযুক্ত শুষ্ক তালু সেই অমৃতের সিঞ্চনে অভিষিক্ত হইতেছে—সার্থক তাঁহার জীবন। সার্থক তাঁহার সাধনা যিনি কঠোর তপস্যায় এই অমৃত হ্রদের একবিন্দু ও পুষ্টি সাধন করিতেছেন, বোধ হয় তাঁহার অপেক্ষা আরও সার্থক তিনি, যিনি ভগীরথের মত তীব্র সাধনায় এই অমৃত হ্রদ হইতে এক বিন্দুও শক্তি সুধা আহরণ করিয়া এক জনও সন্তপ্ত মানবকে দান করিতেছেন।

আমরা মিলিত হইতে চাই, দলবদ্ধ হইতে চাই। মূঢ় আমরা সত্য, কিন্তু তবুও যেন পিপাসা জাগিতেছে। যদি পিপাসা না জাগিয়া থাকে, আসুন মুহূর্ত্তের জন্য ও পিপাসা জাগাই। নিদাঘ-পীড়িত চাতক যেমন নীল গগনের

প্রতি উর্দ্ধমুখে চাহিয়া থাকে, তেমনি করিয়া মধ্যে মধ্যে এক একবার ও আমরা চাহিয়া থাকিব, যদি সেই শক্তি সুধার একবিন্দুর লক্ষাংশের এক অংশও আমরা পাই। আসুন আমরা মিলিত হই, শক্তি সাধনা করি, যদি আমাদের মধ্যে একজনও কৃতী থাকেন, তাহা হইলে সিংহ বিক্রমে তিনি ঐ অমৃত হ্রদের সমীপস্থ হইবেন—ঐ অমৃত আহরণ করিবেন; তাঁহার হস্তের দান এক বিন্দু অমৃতও যদি একজন পিপাসু মানব প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেই আমাদের সকল সাধনা, সকল পরিশ্রম সফল হইবে। যে নিবিড় অন্ধকার আমাদের এই সসীম ও অন্ধকারময় জগতকে সেই আলোকময় অমৃত হ্রদ হইতে দূরবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছে, তাহার অতি সামান্য অংশ অপসৃত করিয়া, একটি সামান্য আলোক-রেখাও যদি আমরা আমাদের সমবেত চেষ্টায় জ্বালিতে পারি- সে আলোক-রেখারমধ্য দিয়া এক জন মানব শিশুও যদি সেই অমৃত হ্রদের পথ দেখিতে পায় তাহা হইলেও আমাদের এই সাধনা সফল হইবে। আমাদের ভাগ্যে হয়ত এখন অমৃতের আস্বাদ ঘটিবে না, সেই অমৃত হ্রদের সমীপস্থ হইয়া অমৃত-বিতরণ ত অতি স্পর্দ্ধার কথা—সে কথা কল্পনায় আনিবারও বুঝি আমাদের যোগ্যতা নাই। কিন্তু শত বৎসর বা সহস্র বৎসরেও যদি আমাদের এই চেষ্টা একটি মানব শিশুকে এই মহাকার্য্যে সামান্য মাত্র সাহায্য করে তবেই আমরা সফল-কাম। অধিক কি আমাদের বহু শতাব্দী ব্যাপী এই সমবেত চেষ্টা যদি একটি ভাব বিন্দুও সেই শাশ্বত অমৃত হ্রদে প্রেরণ করিতে পারে তাহা হইলে ও আমরা সার্থক। তাই আসুন আমরা মিলিত হই, দলবদ্ধ হই—সেই অমৃতময় পুরুষকে স্মরণ করিয়া কর্ম্মের পথে ধাবিত হই—যিনি যে ভাবে পারেন আমাদের এই সমবায়কে সহায়তা করুন।

"শুদ্ধ প্রেম সুখ সিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়;
কহিবার যোগ্য নয়. তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতি যায়। *

চৈতন্য চরিতামৃত।

---

* বাউল—বাতুল; পাতি যায়—প্রত্যয় করে।

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ।

বহুদিন হইল বিদ্যাসাগর মহাশয় এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তের গভীর উদারতা, সার্ব্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃভাব, সাগরোপম সহিষ্ণুতা, লোকবিশ্রুত অসীম দয়া, তাঁহার সারল্য, অদম্য সাহস, আড়ম্বরশূন্য নিষ্কাম কার্য্যকলাপ, হৃদয়ের তেজস্বিতা এবং প্রতিভাময় উজ্জ্বল চরিত্র আজিও জনসমাজের আদর্শ স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং সাধুচেতা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মৃত হইলেও কীর্ত্তি শরীরে জীবিত, তাঁহার ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইলেও তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা লোক শিক্ষার জন্য আজিও আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

আধুনিক বঙ্গভাষা ও শিক্ষা প্রণালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে কতদূর ঋণী, তাহা বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নহে। তাঁহার গভীর শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয়, তাঁহার প্রস্তাবিত সামাজিক সংস্কারের ইতিবৃত্ত বা সমালোচনা, তাঁহার কর্ম্ম জীবনের বৃত্তান্ত, তাঁহার পারিবারিক অবস্থা বা তাঁহার সমসাময়িক সমাজের চিত্র প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেন না তাঁহার কোন কোন কার্য্য চিরনমস্য ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর আদরণীয় হয় নাই। তবে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণের কার্য্যকলাপ সাধারণ দৃষ্টিতে দর্শন করিলে চলিবে না। আমাদের স্বল্পায়তন পরিমাণ যষ্টি বা "মাপ কাঠি" দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও দূরদর্শনের গভীরত্ব মাপিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। তাই আজ তাঁহার ব্রাহ্মণ সুলভ সাত্বিকতা, তাঁহার নির্ম্মল, পবিত্র ও সরলতাময় আড়ম্বর শূন্য কর্ম্ম জীবন, তাঁহার অপরিসীম দয়া এবং তাঁহার নিঃস্বার্থ ও স্বর্গীয় বিশ্ব প্রেমিকতার বিষয় স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইবার প্রয়াস পাইতেছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বদান্যতা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠ্যাবস্থায় স্বীয় বৃত্তির অর্থ হইতে অনেকে দরিদ্র ছাত্রকে পুস্তক, বস্ত্র, ও জলখাবারাদি ক্রয় করিয়া দিতেন, এবং কোন সহাধ্যায়ী পীড়িত হইলে ঔষধ ও কিনিয়া দিতেন। এইরূপ করায় অনেক সময়ে তাঁহাকে নিজে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত; কিন্তু তিনি নিজ অসুবিধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, বরং প্রভূত আনন্দলাভ করিতেন। তাঁহার বদান্যতা ও লোক হিতৈষিতা, ব্যক্তি বা জাতিধর্ম্ম বিশেষে নিবদ্ধ ছিল না। তিনি অনেক

সময় কর্ম্ম জীবনে পরদিনের চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া শেষ কপর্দ্দক ও অতিথি এবং দরিদ্র সেবায় নিযোজিত করিতেন, চন্দননগরে অবস্থান কালে দরিদ্র মুসলমান দম্পতীকে পরিতৃপ্তির সহিত লুচি ও দধি ভোজন করাইয়া অর্থ প্রদান,—মাদ্রাজ হইতে আগত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ যুবকদ্বয়কে সমাদরপূর্ব্বক মাসিক বৃত্তি প্রদান, কত ইউরোপীয়ান বালিকা ও বয়স্থা স্ত্রীলোকের জন্য রীতি মত সাহায্য ব্যবস্থা, প্রতি বৎসর শীতকালে তাঁহার কর্ম্মটাড় বাস ভবনে সমাগত কতশত দরিদ্র সাঁওতালদিগকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ এবং নিজ গ্রাম বীরসিংহে ঐ রূপ দানের সুব্যবস্থা,—প্রভৃতি ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানশীলতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলেও এতদ্বারা দানশৌণ্ড বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়া প্রবৃত্তির প্রকৃত বর্ণনা কদাচ সম্ভাবিত হয় না। বস্তুতঃ আর্ত্ত ও বিপন্নের প্রতি তাঁহার কারুণ্য ক্ষণপ্রভার ন্যায় বিকসিত হই-য়াই লীন হইত না। উহা কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি শান্তিলাভ করিতেন না।

আজি কালিকার লাভ ও ক্ষতির পরিমাণ মত ব্যবসাদারী বিবেচনাপূর্ণ দান ক্রিয়ার দিনে বিদ্যাসাগরের অপরিমিত অদ্ভুত দানের কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাচ্ঞা মাত্র দান, ঋণ স্বরূপ প্রদানের পর তাহা না পাইলেও পুন-রায় সেই প্রার্থীকেই দান, নিজের নিকট অর্থ না থাকিলে ঋণ করিয়াও দান এবং তজ্জন্য প্রচুর সুখানুভব একমাত্র দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়েই দেখা যায়। অমর কবি মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কতদূর কৃতজ্ঞ ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনচরিতে যোগীন্দ্র বাবু দেখাইয়াছেন, এবং পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্যক্তি যে কি পরিমাণে তাঁহার দানের উৎসে সিঞ্চিত ও স্নিগ্ধ হইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যিনি সমস্ত উপার্জ্জ-নই এইরূপে পরকে দান করিতেন, তিনি বোধ হয় দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনগণের দুঃখ দূরীকরণে ততদূর ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু অজানিত দান ব্যতীত স্বীয় দূর সম্পর্কীয় স্বজন পালনের জন্য বৃত্তি ব্যবস্থাতেই তাঁহার প্রায় ৬০০ (ছয় শত টাকা) ব্যয় হইত। সঞ্চয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন,—"আমি ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে বলিয়া আমি তাহা করি নাই।"

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জাহানাবাদ গমন, তদা-নিন্তন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর মহামান্য সার্ সিসিল বীডনের নিকট আবেদন দ্বারা

দুর্ভিক্ষ প্রশমন বিধির প্রসারতা সাধন, এবং নিজগ্রাম বীরসিংহে অন্নসত্র স্থাপনাদির কথা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু ভৃত্যগণ দ্বারা সুসম্পন্ন না হওয়ায় তিনি স্বহস্তে সেই বুভুক্ষু শীর্ণকায় স্ত্রী পুরুষগণের ধূলি ধূসরিত মস্তকে উৎসাহের সহিত তৈল প্রদান করিয়া হৃদয়ের যে মহোচ্চভাবের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা কি আমাদের শিক্ষণীয় নহে?

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। বর্দ্ধমান জিলাতেই উহার প্রকোপ বেশী হওয়ায় কর্ম্মবীর বিদ্যাসাগর মহাশয় তথায় আগমন করতঃ প্রায় ২ বৎসর যাবৎ কি প্রকার অবিশ্রান্ত ভাবে অনেক স্থলে ডাক্তারের অনুগমন, এবং গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ঔষধাদি ব্যতীত পীড়িতদিগের জন্ম নিজ ব্যয়ে পথ্য ও শয্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে মহামান্ত লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যার উইলিয়াম গ্রের নিকট আবেদন করিয়া ৪।৫ মাইল প্রত্যেক স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করাইয়াছিলেন, এবং তৎপরে ঘাটাল মহকুমায় জল প্লাবন হইলে প্লাবন-ক্লিষ্ট স্থল সমুহের অধিবাসীবর্গের সাহার্য্যার্থ অযাচিত ভাবে যাহা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা তাহার জীবন চরিত পাঠকের অবিদিত নাই।

রোগীর শুশ্রূষা।

বর্ত্তমান সময়ে ধনী ও দরিদ্রের প্রতি সমাজের কিরূপ বিসদৃশ ভাব, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। দরিদ্র ও দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণা ও দুঃস্থের প্রতি তাচ্ছিল্য, পক্ষান্তরে ধনী ও ধনের প্রতি মর্য্যাদা এবং অনুরক্তি যেন ধীরে ধীরে সমাজ শরীরে মজ্জাগত হইয়া আসিতেছে। এই কঠোর সময়ে যিনি নির্ধন, দুঃস্থ, পীড়িত এমন কি ভীষণ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তের রুগ্ন শয্যায় উৎসাহের সহিত স্বেচ্ছায় পীড়িতের সেবা ও শুশ্রূষা করিতে পারেন, তাঁহাকে দেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের বিসূচিকা হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্ভীকহৃদয়ে তাঁহার চিকিৎসার জন্ম সাধ্যমত সুব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পাছে অন্যে ভয় পায় অথবা ঘৃণা করে, তাই তিনি রোগীর মূত্র পুরীষাদিও স্বহস্তে মুক্ত করিয়াছিলেন। পরিচিত বন্ধুর ঈদৃশ সাহায্য করিয়াই পরদুঃখ কাতর বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চিন্ত ছিলেন কি? তিনি সর্ব্বভূতে মহাসত্বার উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে অসহায় অবস্থায় পতিত সম্পূর্ণ অপরিচিত পীড়িতের প্রতিও সমান ব্যবহার করিতেন।

বোধ হয় এই জন্তই অমর কবি মধুসূদন ফ্রান্স হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন :—"আমি এখন এক ব্যক্তির নিকট দুঃখ ও প্রার্থনা জানাইয়াছি, যাঁহার প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা প্রাচীন কালের ঋষিদিগের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী, যাঁহার কর্ম্ম কুশলতা ইতিহাস মান্ত ইংরাজ বীর পুরুষদিগের ন্যায় ক্ষিপ্রগতি, এবং যাঁহার হৃদয় বঙ্গদেশীয় মাতৃদেবীদিগের ন্যায় সুকোমল ও অব্যয় অমৃতরসে পরিপূর্ণ।"

উপসংহার।

এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র কর্ম্ম জীবনের বিষয়ে আর ২।১টী কথা বলিব।

গভীর দুঃখের বিষয় এই যে বিদ্যাসাগরের অদৃষ্টে পারিবারিক সুখলাভ ঘটে নাই।

সহধর্ম্মিণীর অকালে দেহত্যাগ প্রভৃতি নানা বিপৎপাতে তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন অন্ধকারময় হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কর্ত্তব্য পরায়ণতাগুণে সংসারের তাবৎ প্রাণীর দুঃখ বিমোচনের জন্ত স্বার্থ এবং স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আজীবন তাহারই উদ্‌যাপনে ব্রতী ছিলেন। যেখানে বিপন্নের কাতরোক্তি সেইখানেই তাঁহার আশ্বাস ও অভয়বাণী অচিরে বিপন্নিবারণে প্রযুক্ত হইত। যেখানে দারিদ্র্যের উৎপীড়ন সেইখানেই তাঁহার সাহায্যকারী হস্ত প্রসারিত হইত। তাহার দানে বিচার বিতর্ক ছিল না। তাঁহার সরলতায় দাম্ভিকতার আবরণ ছিল না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা কারুণ্যরসে আপ্লুত থাকিত। সাম্প্রদায়িকতার জটিল আবরণ ভেদ করিয়া তাহা আপামর সাধারণের কষ্ট বিমোচনে নিয়োজিত হইত।

ইচ্ছা করিলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ "রাজা" বা তদ্রূপ উচ্চ পদবী লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু আত্মোন্নতি ও স্বার্থের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার সমস্ত অর্থ ও শক্তি পরদুঃখ মোচনে প্রযুক্ত হইত।

জাঁক জমক পোষাক পরিচ্ছদ তাঁহার উপেক্ষণীয় ছিল। রোজেরিও প্রমুখ মহানুভব ইংরাজ শিক্ষকদিগের নিকটে শিক্ষিত ও কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের দ্বারা চালিত হইলেও ব্রাহ্মণের চিরাভ্যস্থ মোটা ধুতি থান চাদর এবং চটি জুতা তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। এইরূপ সাধারণ পোষাক তাঁহার স্বগৃহে বা রাজগৃহে অব্যাহত ভাবে ব্যবহৃত হইত।

কর্ম্মক্ষেত্রের বিশেষত্ব নিবন্ধন তাঁহাকে প্রায়ই ইংরাজ রাজপুরুষগণের

সংসর্গে আসিতে হইত। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার আচার ব্যবহার বিকৃত হইয়া যায় নাই। প্রসাদভোজী চাটুকারদিগের ন্যায় তিনি বৃথা ও অসার চাটুবাক্যে স্বীয় রসনা কখনও কলুষিত করেন নাই। ব্রাহ্মণের তেজস্বিতা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে পরিলক্ষিত হইত। সত্য এবং স্পষ্ট কথা বলিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। অনেক স্থলে অপ্রিয় হইলেও নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে উপরিতন কর্ম্মচারীর সমক্ষেও তিনি সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

তিনি পিতামাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালনে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন। কথিত আছে একবার মাতৃ আদেশে বাটী যাইবার জন্য স্বীয় কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং বাটী আসিবার কালে জীবনের আশা পরিত্যাগ পুর্ব্বক সন্তরণ দ্বারা একটী বৃহৎ নদী পার হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ঈদৃশ পিতৃমাতৃ ভক্তি সর্ব্বদা অনুকরণীয়।

ইহাও শুনা যায় যে ভগবৎ নাম উচ্চারিত হইলে তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

মহাপুরুষ দেবপ্রকৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী বা চরিত্র সমালোচনে আমার প্রকৃতই মনে হয়,—

"জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্র জন্তবঃ।
অনেন সদৃশো লোকো ন ভূতোন ভবিষ্যতি।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

বীরভূমের খনিজ সম্পদ। (২)

কয়লা।

কয়লার কারবার করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এরূপ লোক বীরভূম জেলায় বিরল না হইলেও, বীরভূমে কয়লার খনি অত্যন্ত বিরল। পাঠ্যাবস্থায়, বীরভূম কোল কোম্পানী, নিউ বীরভূম কোল কোম্পানী প্রভৃতি নাম শুনিয়া মনে করিতাম যে বুঝি বীরভূমের কয়লা সম্পদ খুব বেশী। সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে। অবশ্য, নিউ বীরভূম কোল কোম্পানী নামক একটি সুপরিচিত সাহেবী কোম্পানী এখনও বর্ত্তমান ; তবে এই কোম্পানী পরিচালিত কয়লার খনি সমুহ যে যে স্থলে অবস্থিত, তাহাদের সহিত বীরভূমের কোন সম্পর্ক নাই, পূর্ব্বেও ছিল না। কলিকাতার বামারলরী কোম্পানী ইহার ম্যানেজিং এজেন্টস্ এবং সর্ব্বসমেত

ইহাদের ১৪টি খনি আছে; তাহার মধ্যে একটি মানভূম জেলায়, ঝড়িয়া ষ্টেশনের নিকট বাঁশতা কোলা গ্রামে ৩টি, সীতারামপুর ষ্টেশনের নিকট বেলরুই গ্রামে একটি, কুল্‌টি ষ্টেশনের নিকট ১টি, চিচুড়িয়া ও আসনসোলের নিকটে ৭টি বারাবনিতে ১টি ও জয়রাম ডেঙ্গায় ১টি অবস্থিত আছে। তবুও, বীরভূমের নাম এই কোম্পানীর সহিত কেন সংযুক্ত হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ বীরভূমে কয়লা খনি আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রথম এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়।

এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ, কয়লার খনি ১ টির অধিক বীরভূমে না থাকিলেও, অনেকের ধারণা এই জেলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, অজয় নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে কয়লার স্তর নিহিত আছে। ৩ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার লায়েক ব্যানার্জ্জি কোম্পানীর পক্ষ হইতে, ঐ অঞ্চলের নাকড়াকোন্দা মৌজায় বোরিং (boring) হইয়াছিল। শুনা গিয়াছিল যে তথায় প্রচুর কয়লা আছে; ৩ বৎসরের মধ্যে তথায় কোন কার্য্যের সূত্রপাত দেখা গেল না। প্রায় সেই সময়েই, অণ্ডাল সাঁইথিয়া রেলওয়ের পাঁচড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী রানীপাথর ও পাথরকুচি গ্রামের দক্ষিণাংশে বোরিং করা হইয়াছিল। সে স্থলেও কয়লা থাকা প্রকাশ, তবে এখনও পর্য্যন্ত কার্য্যারম্ভ বা অন্য কোনরূপ উদ্যোগের লক্ষণ দেখা যায় নাই। কেবল খয়রাশোল খনির অন্তর্গত আরং নামক গ্রামে একটি ক্ষুদ্র খনি, ১৯০৮ খৃঃ অব্দ হইতে খোলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বীরভূম জিলা অজয়ের দক্ষিণ পারে প্রায় রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং পুরাতন জিলাটিকে ধরিলে বীরভূমের কয়লা সম্পদ একেবারে উপেক্ষণীয় হইবে না। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে, রাণীগঞ্জ কোলফীল্ড ও উত্তরে অজয় নদীর গর্ভ অতিক্রম করিয়া বীরভূমেও প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং বীরভূমের দুবরাজপুর ও খয়রাশোল থানার এলাকায় কয়লা আছে বলিয়া জনসাধারণের যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাহা অমূলক মনে করিবার কোন কারণ নাই।

বাংলা দেশের কয়লার খনিগুলিকে প্রধানতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই বিভাগ ভূগর্ভস্থিত কয়লার স্তর অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। বিভাগগুলি এই, ঝড়িয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি, ডাল্টনগঞ্জ এবং রাজমহল কোলফীল্ড, ইহার মধ্যে রাণীগঞ্জ কোলফাল্ডই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিস্তৃত, রাজমহল ও ডাল্টনগঞ্জ ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ, ঝড়িয়া ফীল্ডে বর্ত্তমান প্রায় ২৬৪টি খনিতে কার্য্য

চলিতেছে, রাণীগঞ্জ ফীল্ডে অন্যূন ২৫টি খনি আছে, গিরিডি ফীল্ডের খনির সংখ্যা ৯টি, রাজমহলে ৫টি এবং ডাল্টনগঞ্জে মাত্র ২টি। জেলা হিসাবে এইরূপ হয়, হাজারিবাগে ১০, মানভূমে ২৮১, বাঁকুড়ায় ১টি বর্দ্ধমানে ১৫৮, সাঁওতাল পরগনায় ৫, পালামোতে ২ এবং বীরভূমে ১। এই সমস্ত খনির মধ্যে ২৪৭ টিতে কয়লা উত্তোলন প্রভৃতি কার্য্যে বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

আমাদের আরং কোলিয়ারি রাণীগঞ্জ খনিজ স্তরের অন্তর্গত। ১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯০২ খৃঃ অব্দে সর্ব্ব প্রথমে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু ২।১ বৎসর পরেই নানাকারণে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। কয়লার ব্যবসা অপেক্ষাকৃত উন্নতিলাভ করিলে ১৯০৮ খৃঃ অব্দে পুনর্ব্বার এই খনি খোলা হয়। রাণীগঞ্জ নিবাসী মিঃ জে, এ, মিলার এই কোলিয়ারির সত্বাধিকারী। মহম্মদ হুসেন বক্স এই কোলিয়ারীর কার্য্যাধক্ষ; ইনি আবার শুধু কার্য্যাধক্ষও নহেন, ঠিকাদার ও বটেন। মিলার সাহেব নিজে কোলিয়ারীর কোন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন না কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত ঠিকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমরা গত ডিসেম্বর মাসে এই কোলিয়ারী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই কোলিয়ারীটি অতিশয় ক্ষুদ্র, ইহার কার্য্যও সেরূপ নিয়ম বা শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হয় না, আর গ্রামটি অতিশয় ক্ষুদ্র এবং নগন্য। তবে, ইহার সন্নিহিত প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মনোরম। আরং গ্রামটি, বর্দ্ধমান, বীরভুম ও সাঁওতাল পরগনার সঙ্গম স্থানে অবস্থিত বলিলেও চলে। অজয় নদীর প্রায় দেড়মাইল পূর্ব্বে কোলিয়ারীটির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাঁচড়া ষ্টেসন হইতে আরং ১৮ মাইল; খয়রাশোল পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, তাহার পর রাস্তা খারাপ। অজয়ের অপর পারে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের চুরুলিয়া ষ্টেশন হইতে কোলিয়ারীটি ৩ মাইল দূর।

সাধারণতঃ কয়লা উত্তোলন করিবার দুই প্রকার পদ্ধতি আছে। Pit-System অর্থাৎ মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কাটিয়া কয়লা একটি স্থানে নীত হইলে পর, তাহাকে তথা হইতে উপরে উত্তোলন করিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হয়। এই কার্য্যের জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। আর এক আছে Incline System অর্থাৎ খনির উপর হইতে রাস্তা কাটিয়া ক্রমশঃ তাহার নীচে যাইতে হয় এবং কয়লা কাটিয়া, ইনক্লাইন দিয়া উপরে আনিতে হয়, পাহাড়ের নীচে হইতে উপরে উঠার যেমন ব্যবস্থা। কুলি মজুরেরা মাথায় করিয়া কয়লা বহন করিয়া আনে।

আরং কোলিয়ারীতে কয়লা উত্তোলন করিবার জন্ত ইঞ্জিন নাই। ইহাতে ২টি ইনক্লাইন আছে। আমরা যখন খনি দর্শনে গিয়াছিলাম তখন ইহার প্রথম সংখ্যক ইনক্লাইনে কার্য্য বন্ধ ছিল। দেখিলাম কর্দ্দম ও জলে এই ইন্‌ক্লাইনের রাস্তা গুলি পরিপূর্ণ। ১৯০৮ খৃঃ অব্দের পরে আর এই ইন্‌ক্লাইনে কার্য্য হয় নাই। ৯টি মাত্র স্তম্ভ এই ইন্‌ক্লাইনে কাটা হইয়াছিল। এই ইন্‌ক্লাইনে নামিবার পাকা সিঁড়ি আছে এবং ইহারই নিম্নস্থ জল তুলিয়া ফেলিবার জন্য একটি Pump Engine বাষ্পীয় যন্ত্র চালিত হইতেছে দেখিলাম। দুই নম্বর ইন্‌ক্লাইনে কাজ হইতেছে, প্রায় ৫টি স্তম্ভ আমরা কাটা হইতে দেখিয়াছি, স্তম্ভগুলির মধ্যে পরস্পরের দূরতা ১০ হইতে ১২ ফুট হইবে। পাকা সিঁড়ি না থাকায় এই ইন্‌ক্লাইনে নামা উঠা অতিশয় কষ্টকর।

আমাদের পরিদর্শন সময়ে মাত্র ১২টি কুলি খাটিতে ছিল। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯১০ খৃঃ অব্দে, এই কোলিয়ারিতে মোটের উপর ২২ জন মজুর কার্য্য করিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১৪ জন নীচে এবং ৮জন উপরে, এবং ১৪জন পুরুষ এবং ৮ জন স্ত্রীলোক। সমতল ভূমি হইতে নিম্নতন প্রদেশ পর্য্যন্ত খনির গভীরতা ৭৫ফুট। গত বৎসর মোট ১৬৬৪ টন ১৪ হন্দর কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল এবং তাহার মূল্য ৩৫১১।৶১০ টাকা হইবে। বৎসরের মধ্যে ২৯৯ দিন কার্য্য চলিয়া ছিল। এখানে কোক্ তৈয়ারী হয় না ; এবং গত বৎসর কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

যে সব কারণে আরংকোলিয়ারীতে লাভ হইবার সম্ভাবনা খুব অল্প তাহার মধ্যে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ইহার দূরতাই প্রধান। চুরুলিয়া ষ্টেশন হইতে ব্যবধান মাত্র ৩ মাইল হইলেও মধ্যে অজয় নদী একাই পথরোধ করিয়াছে। বর্ষাকালে পারাপার হইবারও কোন উপায় নাই। আবার পাঁচড়া এইস্থান হইতে বহুদূরে অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ আরংএর কয়লা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর, স্থানীয় লোকে অভাবে এবং নিকটে পায় বলিয়া এই কয়লা ব্যবহার করে ; এবং স্থানীয় অভাব সংকুলান করিবার মত পরিমাণেই কয়লা উত্তোলিত হয়। তৃতীয়তঃ, ইহার পরিচালন ভার একজন শিক্ষিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ম্যানেজারের উপর ন্যস্ত নাই। বাস্তবিক বীরভূম জিলার মধ্যে এই এক মাত্র কোলিয়ারীর এইরূপ দুর্দ্দশা, ইহার সত্বাধিকারীর ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

উপসংহারে বলা আবশ্যক যে পাথর-কুচি ও নাকড়া কোন্দার কয়লাস্তর একবার পরীক্ষা করা উচিত। পাথরকুচি পাঁচড়া ষ্টেশন হইতে মাত্র

২ মাইল এবং নাকড়াকোন্দা ৬ মাইল। পাঁচড়া ষ্টেশন হইতে নাকড়াকোন্দা পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডের পাকা সড়ক আছে।

শ্রীসত্যেশ চন্দ্র গুপ্ত।

কারে ভালবাসি

কত দূর দূর হ'তে বিদেশী বিহঙ্গ আসে
কত নদ কত নদী সাগর পর্ব্বত ঠেলি
কত ভাব কত স্বর মাখা,
কত যে নূতন গানে কি কত নূতন তানে
মধুর কি গীতখানি বনে থেকে শিখে এসে
গেয়ে গেয়ে দিয়ে যায় দেখা।

২

সাঁতারি আকাশ কোলে চেয়ে চেয়ে দেখে যায়
কোন্ দেশে হৃদয়ের ভালবাসা রূপ রঙ্
ফুটিয়াছে কোথা সেই জানে
পড়িলে নয়ন পথে বুঝি সে শ্যামলছটা
গুণ গান গেয়ে গেয়ে মুহূর্ত্তের তরে এসে
মাতায় নিকুঞ্জ মধুতানে।

৩

শস্য-মেঘমালা বুকে চঞ্চল তড়িৎসম
ছুটে ছুটে বুক পেতে তরঙ্গে ভাসিয়ে যায়
চলে যায় আবার কোথায়,
ভালবাসা রূপ বটে, মধুর ললিত তান,
আপনার ক্ষুদ্র প্রাণে যা দেখে সে ভাল বাসে—
ক্ষুদ্র সে, পবনে ভেসে যায়;

৪

কোমল শিশির কণা নিশীথে ঝরিয়া পড়ে
গোপনে গোলাপ দলে সোহাগে ফুটায়ে যায়—
ভালবাসা বড় ভাল বাসে
সুস্নিগ্ধ স্নেহের বিন্দু— নিন্দিত মুক্তার মালা—
সহেনা সূর্য্যের ছটা নিমেষে শুখায়ে যায়,
মিশে যায় পবনের শ্বাসে।

৫

বনের উড়ন্ত পাখী, ক্ষুদ্র শিশিরের কণা
ভালবেসে কান্দিবার কার এত সাধ আছে—
তাই ভাবি কারে ভালবাসি ?—
না যদি বাসিয়ে ভাল আমি যদি ভাল থাকি
কি ক্ষতি আমার তায়— শুধু তার গীত গাব—
যবে মন, চলি যাবে আসি।

৬

যদি ভাল বাসি কভু, অত ক্ষুদ্রকণা নয়,
ও পাখী যে বনবাসী সেই বন ছায়াতলে
বসি একা আপনার মনে ;
যে বিশাল হৃদি বুকে মিশায় শিশির কণা
সেই সাগরের জলে হৃদয়ের ভাল বাসা
ঢেলে দিব গোপনে গোপনে।

৭

ভালবাসা গীত গাব ছুটে যাবে বনে বনে
করি প্রতিধ্বনি তান বাতাসে ভাসিয়া যাবে
মিশে যাবে, শুনিবেনা কেউ ;
বনের পাতাটি তুলি "কারে ভাল বাসি" লিখি
সাগরে ভাসিয়ে দিব দূরে বয়ে নিয়ে যাবে
বুকে ধরি সাগরের ঢেউ।

৺ মহম্মদ আজীজ উস্ শোভান।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে স্থানীয় কম্বদন্তী ।

চণ্ডীদাসের জন্ম স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত
নু র গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর পূজক ছিলেন এবং এই নান্নুরে বসিয়াই তিনি
হার সুললিত কবিতা রচনা করেন সে বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু তিনি
নুরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিম্বা অন্ত কোন স্থান হইতে আসিয়া নান্নুরে
স স্থাপন করেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে, কেহ কেহ বলেন নান্নুরই তাঁহার
র স্থান, আবার কেহ কেহ বলেন তিনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাৎনা
নক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

রামী'র ব্যাপারে চণ্ডীদাস প্রায়শ্চিত্ত করেন। চণ্ডীদাসের প্রায়শ্চিত্ত করি-
র বোধ হয় তেমন ইচ্ছা ছিল না, তাঁহার খুড়িমা ও তাঁহার খুড়িমার পুত্র
ড়ের অনুরোধেই তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। নান্নুর গ্রামে
হার খুড়িমা প্রভৃতির অবস্থিতি দেখিয়া মনে হয় যে চণ্ডীদাস যে পরিবারে
গ্রহণ করিয়াছিলেন সে পরিবার নান্নুরেরই অধিবাসী। যাহা হউক এ
াণ অকাট্য নহে।

চণ্ডীদাসের সাংসারিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায়
। তাঁহার ভিটা দেখিয়া খুব বড় লোকের বাড়ীর ধ্বংশাবশেষ বলিয়া
ধ হয়। তবে ভিটাটি বিশালাক্ষী দেবীর প্রাচীন মন্দিরের—চণ্ডীদাস দেবীর
বাইত থাকিলে ও থাকিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র
াচার্য্য মহাশয় বিশালাক্ষী দেবীর সেবাইত। তিনি বলেন চণ্ডীদাস তাঁহা-
র বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, যদি করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি তাহা
রগত নহেন।

চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ শাক্ত ছিলেন। তাঁহার উপাস্যা দেবী বিশালাক্ষী শক্তি
ই। দুর্গোৎসবের সময় বিশালাক্ষীর পূজার বেশ ধুমধাম হয়। সন্ধি পূজায়
গ বলি ও নবমী পূজায় ছাগ, মহিষ ও মেষ বলি হইয়া থাকে।

বিশালাক্ষী চণ্ডীদাস কর্ত্তৃক স্থাপিতা নহেন। জন প্রবাদ আছে যে 'নল-
জা' নামক এক জন রাজা বা বড় লোক নান্নুরে বাস করিতেন। (অবশ্য
ই মহাভারতোল্লিখিত নলরাজা না হইতে ও পারেন।) এখনও নান্নুরের
ক্ষণ পশ্চিম মাঠে 'নলগড়্যা' নামক এক পুষ্করিণী আছে। বিশালাক্ষী এই
রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিতা।

চণ্ডীদাসের সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে অনেকে নানা রূপ কথা লিখিয়াছেন, নান্নুরে সে সম্বন্ধে কোন রূপ জন-শ্রুতি নাই।

নান্নুর গ্রাম নল রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত। নান্নুরের দক্ষিণ পশ্চিম মাঠ প্রাচীন নান্নুর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথায় নলগড়্যা, ঘি গড়্যা, তেল গড়্যা প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট বড় জলাশয় আছে। ইহার অধিকাংশ জলাশয়েরই তলদেশ পর্য্যন্ত ইষ্টক দিয়া বাঁধান।

কথিত আছে চণ্ডীদাস যখন নাম সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন সেই সময় কালাপাহাড় নান্নুর গ্রামে সসৈন্যে আগমন করেন। চণ্ডীদাস নিজের জাতি রক্ষার জন্য অট্টালিকাকে পতিত হইবার জন্য আদেশ করেন। তদনুযায়ী অট্টালিকা তাঁহার উপর পতিত হয়। কালা পাহাড় বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির ধূলিসাৎ দেখিয়া, তন্নিকটবর্ত্তী দুইটি শিবমন্দির ছেদন করিয়া চলিয়া যান। এখনও উক্ত ছেদিত শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি মন্দির গত বৎসর পড়িয়া গিয়াছে—একটি মন্দির এখনও আছে। কালাপাহাড় নান্নুর গ্রামের আরও অনেক দেবমূর্ত্তি ধ্বংশ করিয়াছিলেন! সেই ধ্বংশাবশিষ্ট দেবমূর্ত্তিগুলি লইয়া গ্রামের লোক ষষ্ঠী দেবী করিয়াছে এবং চণ্ডীদাসের ভিটার উপর স্থাপিত হইয়াছে! বিশালাক্ষীর নাসিকা কর্ত্তিত। লোকে বলে উহা কালাপাহাড়ের কীর্ত্তি

চণ্ডীদাসের মৃত্যু বা দেহত্যাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে জনশ্রুতি বর্ণিত হইল, তাহা ছাড়া অন্যরূপ জনশ্রুতি ও আছে। নান্নুর হইতে চারি মাইল উত্তরে কীর্ণাহার গ্রামে চণ্ডীদাসের সমাধি দৃষ্ট হয়। এই সমাধি সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। চণ্ডীদাস কীর্ণাহারে কীর্ত্তন করিতেছিলেন. কীর্ণাহার নিবাসী একজন ধনাঢ্য মুসলমান পরিবারের একটি রমণী কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছিলেন। এই কারণে ঐ মুসলমান চণ্ডীদাসকে ধরিয়া আনিবার জন্য আদেশ দেন। চণ্ডীদাস জানিতে পারিয়া অট্টালিকাকে পতিত হইতে আদেশ করেন। বলা বাহুল্য চণ্ডীদাসের আদেশে অট্টালিকা তৎক্ষণাৎ পতিত হইল।

যাহা হউক চণ্ডীদাসের তিরোধানের পর বিশালাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি কিছুকাল চণ্ডীদাসের ভিটায় মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে দেবী এক তিলিদের বৌকে স্বপ্নাদেশ করেন। সেই আদেশ অনুসারে স্ত্রীলোকটি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় সেই ভিটার মধ্যে একটি স্থানে গোময় লেপন করিত। নিয়মিতরূপে দেবস্থান এই প্রকারে মার্জ্জনা করাকে এদেশে 'মারুলি দেওয়া' বলে। স্থানটি সেই সময়ে

নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। স্ত্রীলোকটিকে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় এই প্রকারে একাকী বনমধ্যে যাইতে দেখিয়া তাহার স্বামীর মনে সন্দেহ হয়। ক্রমে সে তাহার স্ত্রীকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করে। তিরস্কৃত হইয়া স্ত্রীলোকটি দেবীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে পর দেবী তাহার স্বামীকে স্বপ্নে আদেশ করেন —"তোর স্ত্রী অসতী নহে সতী। আমার মন্দির মার্জ্জনা করিবার জন্যই সে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এখানে আসিয়া থাকে। আমি বিশালাক্ষী, বহুদিন অপ্রকাশ হইয়া আছি, আর গোপনে থাকিবার ইচ্ছা নাই। 'ভিটের' মধ্য-স্থলে যে অশ্বথগাছ আছে, তাহার নীচে প্রথমে তোর স্ত্রী কোদালি দ্বারা খনন করিবে, তাহার পর তুই খনন করিয়া আমাকে তুলিবি।" স্বপ্ন অলীক বিবেচনায় প্রথমে তাহার এ কথায় বিশ্বাস হয় নাই, অধিকন্তু তাহার স্ত্রীকে সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী হইতে তৈল প্রদীপও গ্রহণ করিতে দেয় নাই। তাহার স্ত্রী বাটিতে তৈল প্রদীপ না পাইয়া দেবীর নিকট প্রার্থনা করে, দেবী তাহাকে আদেশ করেন যে 'ঢিপি'র দক্ষিণে 'দেকুড়া' নামক যে জলাশয় আছে সেই জলাশয়ের জলে একগোছা খড় ভিজাইয়া লইলে তাহাই জ্বলিবে। সেদিন এই প্রকারে দেবী স্থানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার জন্য স্ত্রীলোকটি জঙ্গল মধ্যে চলিয়া গেলে তাহার স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল ও দেখিল তাহার স্ত্রী বাড়ীতে নাই। সে তদনু-সারে তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার স্ত্রী জল-সিক্ত খড়ে অগ্নি প্রজ্বালন করিতেছে। তখন, পূর্ব্বে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল সেই স্বপ্নে তাহার বিশ্বাস হইল ও স্ত্রীর উপর তাহার সমস্ত ক্রোধ ও সন্দেহ এক-কালে দূর হইল। সে বিস্ময়ে একরূপ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার স্ত্রী তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া আসে। পর দিন প্রত্যূষে সে দেখিল যে তাহার একটি দুগ্ধবতী গাভী গোয়ালে নাই, গাভীর সন্ধানে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল তাহার গাভিটি সেই অশ্বথবৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর তাহার স্তন হইতে আপনি দুগ্ধক্ষরণ হইতেছে। প্রথমে সে অবাক হইয়া গেল। তাহার পর স্নানান্তে লোকজনকে লইয়া সেই স্থানে গেল, যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল সেইরূপ কার্য্য হইল। প্রথমে তাহার স্ত্রী পরে সে নিজে ঐ স্থান খনন করিলে পর দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। বর্ত্তমান বিশালাক্ষী বা বাশুলি দেবীর মূর্ত্তি-উদ্ধার সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী। নদীয়া জেলার অন্ত-র্গত উলাগ্রামের কায়স্থ জমিদারগণ তখন নান্নুরের জমিদার ছিলেন। তাঁহারা দেবীর বর্ত্তমান পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

মহানবমীর দিনে বিশালাক্ষী দেবীর পূজা এখনও খুব ধুমধামের সহিত হইয়া থাকে। ঐ দিনে তিলিদের পাঁঠা সকলের অগ্রে দেবীর নিকট বলি হওয়ার রীতি আছে। শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে অর্থাৎ দেবী-মূর্ত্তি ভূতল প্রোথিত হইবার পূর্ব্বে মহানবমীর দিন সর্ব্বাগ্রে অন্ত লোকের পাঁঠা বলি করিবার রীতি ছিল। দেবীর পূজা পুনঃ স্থাপিত হওয়ার পর কাহার পাঁঠা সর্ব্বাগ্রে বলি হইবে এই লইয়া গোলযোগ হয়। গ্রামের জমিদার, পুরোহিত, গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ও তিলিগণ ইহাদের মধ্যেই বিরোধ হয়। শেষে মীমাংসা হয় সকলের পাঁঠা একসঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, যাহার পাঁঠা দেবীর নিকটে অথবা হাড়কাঠের নিকটে স্বেচ্ছায় সর্ব্বাগ্রে আসিবে, তাহার বলিই সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করা দেবীর অভিপ্রায়। তদনুসারে সমস্ত পাঁঠাগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কেবলমাত্র তিলিদের পাঁঠাটি আসিয়া হাড়কাঠের নিকট দাঁড়াইল অন্যান্য পাঁঠাগুলি পলাইয়া গেল। এই সময় হইতেই তিলিদের পাঁঠা সর্ব্বাগ্রে বলি হইবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। তিলিগণ এই দেবীর প্রতি ভক্তিমতী বৌটির উপর অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া দেবী তাহাদিগকে নান্নুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। এই তিলি বংশ এখন কেতুগ্রামে বাস করিতেছে, কেতুগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। এখনও তাহারা কেতুগ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মহানবমী পূজার দিন দেবীর বলি পাঠাইয়া দেয়।

এই বলি সম্বন্ধে একটি জন শ্রুতি আছে। অনেকে বলেন তাঁহারা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছেন। যাহা হউক সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, আমরা সেই জনশ্রুতি যথাযথ প্রদান করিতেছি।

একবার দুর্গোৎসবের সময় অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি ও প্রবল বন্যা হয়। এমন কি অষ্টমী নবমীর দিন কাহারও বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপায় পর্য্যন্ত ছিল না। তিলিগণ ভাবিয়া আকুল, কেমন করিয়া দেবীর পূজার বলি পাঠাইবে? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বেলা দশটার সময় পাঁঠার গলায় একখানি বস্ত্র ও পূজার দ্রব্যের মূল্যস্বরূপ একটি টাকা বাঁধিয়া পাঁঠাটিকে গ্রামের বাহিরে ছাড়িয়া দিল। মহানবমীর দিন বৈকালে বিশালাক্ষী দেবীর পূজার পদ্ধতি চিরদিন প্রচলিত। পূজার সময় উপস্থিত, সকলেই ভাবিতে লাগিল এই দুর্য্যোগে কেতুগ্রাম হইতে বলি আসা একেবারে অসম্ভব। পুরোহিতগণ ভাবিতেছেন কি করা যায়, এমন সময়ে সেই পাঁঠা আসিয়া পূজার স্থানে উপস্থিত।

বিশালাক্ষী দেবীর পূজায় প্রত্যহ মৎস্য বা মাংস দিবার রীতি আছে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

নান্নুর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

স্থানীয় কিম্বদন্তী সংগ্রহ করা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কার্য্য। আমাদের পরিষদের যে সমস্ত উৎসাহী বন্ধু এই প্রকারে কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছেন, পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিম্বদন্তী সংগ্রহে বিশেষ সততা ও সতর্কতার প্রয়োজন; ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক এই সমস্ত কিম্বদন্তী ব্যবহার করিবেন। কিম্বদন্তী সংগ্রহ বড়ই দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ। কেহ কেহ উপন্যাস রচনা করিয়া কিম্বদন্তী বলিয়া তাহা জনসমাজে প্রচার করিতেছেন, অথবা সামান্য কিম্বদন্তীকে নানারূপে কাল্পনিক ব্যাপারের দ্বারা সাজাইয়া তাহার বিকৃতি সম্পাদন করিতেছেন, আমরা অনুসন্ধানের দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়া অতীব দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। অজ্ঞানতার জন্যই হউক আর কোনও রূপ স্বার্থ সাধনের জন্যই হউক অনেক মূর্খ লোকে সাহিত্যক্ষেত্রে এই দুর্নীতিকর কার্য্য করিতেছেন।

কিম্বদন্তী হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ কি প্রকারে নিস্কাসিত হয় তাহা দেখাইবার জন্য উদাহরণ স্বরূপে আমরা পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তীগুলি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিতে পারি। এই আলোচনার দ্বারা যে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি নিরূপিত হইবে সে গুলিকে কেহ যেন অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা না করেন। একটি মাত্র কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, অনেকগুলি পারিপার্শ্বিক প্রমাণের দ্বারা সেই তথ্যের ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হওয়া প্রয়োজন। যাহা হউক আমরা কেবল মাত্র উদাহরণ স্বরূপে পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তীগুলির আলোচনা করিতেছি।

চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিয়া মনে হয় তিনি পূর্ব্বে তান্ত্রিক শক্তি উপাসক ছিলেন পরে বৈষ্ণব হন, অধিক কি চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব মত বা সহজ উপাসনার মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যাহা তন্ত্রাচার হইতে গৃহীত।

পূর্ব্ব হইতেই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী চলিত আছে যে একদিন নদী-স্রোতে একটি পদ্মফুল ভাসিয়া যাইতেছিল, চণ্ডীদাস তাহা যত্ন পূর্ব্বক

আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা করেন—সে পুষ্পটি বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, চণ্ডীদাস তাহা জানিতেন না। রাত্রিকালে বিশালাক্ষী দেবী চণ্ডীদাসকে স্বপ্ন দেন যে এই পদ্ম তুই আমার চরণে দিয়াছিলি কিন্তু আমি তাহা মস্তকে ধারণ করিয়াছি, কারণ ইহা আমার ইষ্টদেবের নির্ম্মাল্য। এই স্বপ্নাদেশের পর বিশালাক্ষীর পূজক চণ্ডীদাস বৈষ্ণব হইলেন।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মেঝিয়া গ্রামের নিকট 'শালতড়া' নামক গ্রামে অবস্থিত 'নিতা' নামক দেবীর সহচরী বাশুলীর প্রভাবে চণ্ডীদাসের ধর্ম্মগত মত পরিবর্ত্তিত হয়। বাঁকুড়া জেলা অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র, সেখান হইতে সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠাবান মহাজনের প্রভাবে দুই চারি জন লোকের মত পরিবর্ত্তন খুবই সম্ভবপর ঘটনা। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য যৎকালে বৃন্দাবন হইতে গোস্বামী দিগের গ্রন্থাদি লইয়া বঙ্গদেশে আসিতেছিলেন সেই সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজার সভায় ব্যাসাচার্য্য নামক শ্রীমদ্ভাগবতের জনৈক পণ্ডিতের অবস্থিতি, তৎকর্ত্তৃক ভ্রমর গীতা পাঠ ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট ভাগবত শ্রবণ মাত্রেই রাজা বীরহাম্বিরের ভাবোদয় এই সমস্ত ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক বাঁকুড়ায় চৈতন্য দেবের ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে এবং খুব সম্ভবতঃ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। যে প্রভাবে চণ্ডীদাসের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয় তাহা বাঁকুড়া হইতে সমাগত হওয়াই সম্ভব।

ইহা ছাড়া আরও অনেক কথা ভাবিবার আছে। বঙ্গের সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাসে চারিটি বিভিন্নমুখী শক্তির ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। কতদিন হইতে এই চারিটি শক্তি-প্রবাহ সমাজ মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে অথবা কোথা হইতে ইহাদের উদ্ভব হইল তাহা এখন নিরূপণ করিবার চেষ্ট করার প্রয়োজন নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা এই চারিটি শক্তি প্রবাহের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ দেখিতে পাই এবং এই পঞ্চদশ শতাব্দীই বাঙ্গলার ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব ময় যুগ। যে চারিজন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক কেন্দ্র নবদ্বীপে এই চারিটি শক্তি-প্রবাহ আত্মবিকাশ করে এবং বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলো-

ত করে তাঁহাদের নাম বঙ্গবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত, ন্যায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ এই চারিজন াপুরুষ। এই চারিজন মহাপুরুষের উদ্ভব একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। ধবেন্দ্র পুরী, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি ভক্ত ও কবি, এবং প্রাচীন র তন্ত্র গ্রন্থ, যাহার বিশেষ প্রামান্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় স্বীকার রিয়াছেন তৎসমুদয়ে ন্যায় শাস্ত্রের নিন্দা ও অন্যান্য এমন অনেক প্রমাণ ছে যাহার সাহায্যে এই চারিটি বিভিন্নমুখী শক্তি প্রবাহের বঙ্গীয় সমাজে তি প্রাচীন কাল হইতে অস্তিত্ব প্রমানীকৃত হয়। বিশেষ শক্তিশালী ব্যক্তির ভ্যুত্থান নিবন্ধন এই চারিটির মধ্যে কোনও একটি বিশেষ প্রভাব কোনও ানে প্রাধান্য লাভ করিত আবার সময়ে অন্য এক জনের অভ্যুত্থানের দ্বারা পর এক শক্তি কিছু দিনের জন্য আধিপত্য লাভ করিত। এই প্রকারে ঙ্গর সমাজ শরীরের উপর এই চারিটি শক্তি পর পর ক্রমান্বয়ে নিজ নিজ াধিপত্য বিস্তার করার পর পঞ্চদশ শতাব্দীর বিপুল আন্দোলন যুগপৎ চারি- র মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া সংঘটিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর এমন ১ আধুনিক সময় পর্য্যন্ত ও সেই চারিটি শক্তির ক্রিয়া ঠিক পূর্ব্বের মত চলি- তেছে তাহাও দেখাইতে পারা যায়।

চণ্ডীদাসের আবির্ভাব নিবন্ধন নান্নুর প্রভৃতি স্থানে তান্ত্রিক প্রভাব কিছু নের জন্য মন্দীভূত হইয়াছিল পূর্ব্বের কিম্বদন্তী তাহার ও আভাস বহন করি- তেছে। রামীর ব্যাপারে চণ্ডীদাস প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, পরি- ণামে প্রায়শ্চিত্তের সময় কোনও ঘটনায় চণ্ডীদাসেরই জয় হয় এ বিষয়েও কম্বদন্তী আছে। কেবল তান্ত্রিক মতের সহিত নহে স্মৃতির সহিত ও চণ্ডীদাসের ইখানে বিরোধ দৃষ্ট হয়। তাহার পর যে শক্তি প্রভাবে বৈষ্ণব প্রভাব ঈষৎ র্ব্বীকৃত হইয়া তান্ত্রিক প্রভাবের আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই শক্তি ।নবদ্বীপ অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল তাহা ও এই সমস্ত কিম্বদন্তী হইতে াওয়া যাইতেছে। নবদ্বীপ অঞ্চলের পণ্ডিত, অভিজাত ও ব্রাহ্মণ প্রধান মাজ সাম্যমূলক বৈষ্ণব আন্দোলনের যে পরিপন্থী ছিল তাহা কেবল কৃষ্ণচন্দ্র াজার যুগে বা চৈতন্যদেবের যুগেই নহে, তাহার পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপ সমাজ াই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, পূর্ব্বের কিম্বদন্তী হইতে এই ব্যাপারের আভাস াওয়া যায়।

যাহা হউক বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

নহে। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় কিম্বদন্তী সমূহ সংগৃহীত হই-তেছে—যাঁহারা এই সমস্ত কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া স্বদেশের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন তাঁহাদিগকে কিম্বদন্তীর মূল্য বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, সেই জন্যই পূর্ব্বের কথাগুলি অতি সংক্ষেপে কথিত হইল। সময়ান্তরে আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করিতে সক্ষম হইব।

পূর্ব্বের কিম্বদন্তী সমূহ হইতে আর একটি ভাবিবার কথা আছে। বীরভূম জেলার মধ্যে প্রাচীন দেবমন্দির সমূহে অনেক ভগ্ন দেব বিগ্রহ আছে। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে এই সমস্ত কালাপাহাড়ের কীর্ত্তি চিহ্ন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত ঘোষগ্রাম, কামালপুর, বক্রেশ্বর, কলেশ্বর, ভাণ্ডীরবন প্রভৃতি স্থানে কিম্বদন্তী অনুসারে কালাপাহাড়ের এই কীর্ত্তি বিদ্যমান। চণ্ডীদাসের কিম্বদন্তীর মধ্যে কালাপাহাড়কে দেখিয়া বড়ই সন্দেহ হয়। কালাপাহাড় যদি দাউদ খাঁর সেনাপতি হয়েন তাহা হইলে চণ্ডীদাস তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। এই রূপ অনুমান হয় দেব মূর্ত্তি ভগ্নকারী বিজেতা মাত্রেই পরবর্ত্তীকালে কালাপাহাড় আখ্যা পাইয়াছেন। অন্ততঃ পক্ষে কালাপাহাড় এই নামটি হইতে এইরূপই অনুমান হয়।

সবি সেই, সবি সেই।

অনন্তকাল সমুদ্রের বুদ্বুদ,—এই উঠে, এই ডুবে,—ঐ ভেসে কোথায় ছুটে যায়। এক যায় আর আসে,—কি যে যায়, কি যে আসে, আবার কেন আসে—কেন যে যায়,—এমন ঢেউ দিয়ে দিয়ে—কোন আঁধারে মিশে যায় তা কিছুই বুঝা যায় না, দেখি শুধু, এক যায়, আর আসে!

মানবের ইতিহাসের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। কত যুগ যুগান্তর, কত দেশ দেশান্তর; এই বিপুল প্রচণ্ড ধারার মাঝে আসিয়া মিলিত হইতেছে। কত ঢেউ, কত বেগ, কি গর্জ্জন। কে তাহার সীমা করিতে পারে? কত ডুবাইয়া ভাসাইয়া—অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে, কত কি ভাঙ্গিয়া দিতেছে, কত কি গড়িয়া তুলিতেছে,—আবার দেখিতে দেখিতে তাহাও এক দিন ধূলিতে বিলীন হইতেছে! যেখানে অরণ্য ছিল—সেখানে নগর বসিয়াছে; যেখানে নগর ছিল সেখানে প্রাচীন কীর্ত্তির শুধু একটা ধ্বংসাবশেষ-মাত্র দেখা যাইতেছে। ইহাই মানবের ইতিহাস।

কি চঞ্চল এই জগৎ সংসার! কি পঙ্কিল এই স্রোত, স্রোতের নিম্নে কিছুই দেখা যায় না, উপরে যাহা ভাসিয়া উঠে ক্ষণিকের তরে তাহাই চাহিয়া দেখি, আবার যাহা দেখি, তাহাও কি সব বুঝিতে পারি? এমনি করিয়া কিছু দেখিয়া, কত ভুল করিয়া, কত না বুঝিয়া মনুষ্যের এই জীবন লীলার নিত্য অভিনয় চলিতেছে। কি সে অভিনয়—কি যে তার উদ্দেশ্য কোথায় যে তার পরিণতি, কি করিয়া বলি? দেখি মানুষ হাসে, আবার কাঁদে। উঠিতে চায়, পড়িয়া যায়—সঙ্কল্প করে, রাখিতে পারে না। কি দেখিয়া ছুটিয়া যায়, আবার যেন তাহা নয় দেখিয়া ফিরিয়া আসে। প্রত্যেক কেন্দ্র হ'তে কি যেন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেছে; আবার কাছে আনিয়াই ফিরাইয়া দিতেছে। "নয়—তাহা নয়!" শুধু আহ্বান শুধু বঞ্চনা। অনেক ভুগিয়া, অনেক দেখিয়া কিছুই যেন আর শেষ পর্য্যন্ত তেমন থাকে না। শৈশবের ক্রীড়া, যৌবনের স্বপ্ন, বার্দ্ধক্যের হতাশা,-কত প্রভেদ—তবু শিশু খেলে, প্রণয়ী স্বপ্ন দেখে, বৃদ্ধ ভাবিয়া আকুল হয়। ইহাই সংসার! তবু রাত্রি দিন ইহারি অভিনয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত, সুখে দুঃখে পাপপুণ্যে, আশায় নিরাশায় নিত্য তরঙ্গিত—ইহার কি শেষ আছে? ইহার আরম্ভ কোথায়, তাই বা কে জানে?

একটি মনুষ্যজীবনের পরমায়ু কতটুকু? যে জাতির জীবনে এই ব্যক্তিগত মনুষ্য জীবনের ক্রমিক উত্থান ও পতন, জন্ম ও মৃত্যু, আলোক ও আঁধারের নিত্য লীলাভিনয় চলিতেছে,—একটি বিশেষ ধর্ম্ম, একটি বিশেষ ভাষা, কতগুলি বিশেষ আচার ব্যবহার লইয়া ব্যক্তিগত জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংবদ্ধ এই যে জাতীয় জীবন, তাহার ইতিহাসই বা কতটুকু? অনন্তকালের বুকে,—কোথায় তার চিহ্ন, কত দিন স্থায়ী হইতেছে? একটি মানুষের জীবন যেমন জাতির জীবনে লয় পাইতেছে,—তেমনি আবার এই জাতীয় জীবন কত দেশ, কত দিক্ হইতে আসিয়া, বিশ্বমানবের ইতিহাসের ধারায় মিশিয়া যাইতেছে? এই বহু তরঙ্গসঙ্কুল বিশ্বমানব সমুদ্রে জাতীয় জীবন নদী কোথায়ও বা কিছু দিন তাহার স্বতন্ত্র চিহ্ন অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছে, আবার দেখিতেছি, কত স্থানে এই প্রয়াস ব্যর্থ হইতেছে। কত রাজ্য, কত জনপদ, কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত ধর্ম্ম, কত ভাষা, কত সভ্যতা, কত ইতিহাস, একের পর আর—আসিয়াছে—চলিয়া গিয়াছে, আজ তাহা কে মনে করিয়া রাখিয়াছে? আজ তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? মানবের ইতিহাসের কোন্ অংশ কি লুকাইতেছে কোন্ অংশ কি বাহির করিয়া দিতেছে, কোন্

জাতির জীবনে কি তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, কি স্বপ্ন সফল হইতেছে? আবার কেন যে অন্যত্র তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে, এত ত্যাগ, এত উদ্যম সকলি ব্যর্থ হইতেছে। কেন, তাহা কে বলিতে পারে। কে নির্ণয় করিতে পারে? ইতিহাসের বিবর্ত্তন উর্ণ-নাভের জালের মত; কেন এই জাল রচনা? এই বিস্তার এই বিলাপ, এই আলোক, এই অন্ধকার, এই সৃষ্টি, এই প্রলয়। কেন? তাহার উত্তর কে দিতে পারে?

তবু যতদূর দেখা যায় এমনি চলিয়াছে কে জানে কতকাল এমনি চলিবে! অনন্ত স্থান ও কালে কার্য্যকারণের নিত্যসম্বন্ধ লইয়া একটি অফুরন্ত ধারা বহিয়া চলিয়াছে। তার বেশী মানুষ কি বুঝিতে পারে? এই রহস্যভেদের চেষ্টা কত দেশ বিদেশে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহার কি পরিণাম? সন্দেহ বাড়িয়াছে না কমিয়াছে, সমস্যার মীমাংসা হইতেছে, না তাহার জটিলতার বৃদ্ধি পাইতেছে? একদিনে এক মুহূর্ত্তে তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা অসম্ভব? তা না হইলে সৃষ্টির কার্য্য ফুরাইয়া যায়, সমস্ত আলো একসঙ্গে জ্বলিয়া সহসা চিরতরে নিভিয়া যায়? অই আলো ও অন্ধকার—তাই সন্দেহ ও মীমাংসা,—আবার সন্দেহ আবার মীমাংসা! এমনি অনন্তকাল! কে জানে ইহার কি অর্থ।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, তাহার জাতির জীবনে, জাতীয় জীবন বিশ্বমানবের চিত্ত সমুদ্রে, আবার এই বিশ্বমানব আরো ব্যাপক আরো গভীর কোন এক অখণ্ড অনন্ত জীবনের মধ্যে নিত্য তরঙ্গিত হইতেছে। কি ভাবে যে এই অংশ ও সমগ্রের মধ্যে অহর্নিশি দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় চলিয়াছে কে তাহা বলিতে পারে? কত ঋষির ধ্যান, কত কবির স্বপ্ন, কত বীরের উদ্যম—আর তাহাও কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন ব্যাপৃত রহিয়াছে। তবু আজ আমরা আসিয়া কোথায় দাঁড়াইয়াছি? সম্মুখে না পশ্চাতে? না যেখানে সেই-খানেই তেমনি দাঁড়াইয়া আছি? আজো সেই ধ্যান, সেই স্বপ্ন, সেই উদ্যম, সম্মুখে নিয়ত গর্জ্জনশীল সেই এক দুস্তর অনন্ত পারাবার। সেই তরঙ্গ, তারি উত্থান ও পতন। সেই নির্ব্বিকার সৌম্য নীলাকাশ,—সেই আবিল চঞ্চল কালো জল,—সেই কঠিন মর্ত্ত্যের বেলাভূমি,—কঠিন বড় কঠিন,—কোমলতার আভা লইয়া সে কি কঠিন! সবি—সেই। সেই সুখ সেই দুঃখ,—সেই পাপ—সেই পুণ্য,— সেই প্রেম—সেই ভোগ—। সবি সেই? সেই মায়া সেই ছায়া, একের পর আর; ব্যক্তি ও জাতির সম্মুখে, প্রতিপলে প্রতি যুগে, সেই ভ্রান্তি—সেই প্রলোভন। কাছে যাও,—আরো যাও—হৃদয় দিয়া স্পর্শ কর,—একি—!

সেই হিম আর কঠিন কঙ্কাল— ! হায়, এযে সবি সেই ! ডুবিয়া ভাসিয়া,— কাঁদিয়া ভুগিয়া মানুষ তবে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইতেছে ? কোথায় তীর ? কোথায় তীর ? এদিকে অকূল সমুদ্র, ঐ অর্দ্ধ গোলাকৃতি শ্বেত বেলা, তারপর আবার ঐ দগ্ধ মরুভূমি। সকলি চঞ্চল, সকলি ভাসমান, বহিয়া যায়, ফুরাইয়া যায়,—কোথায় যায় ?

দুইটি স্রোত,—অন্তরে ও বাহিরে—তবু দুই-এক,—আবার একই দুই ! মানবের চিত্তে ও ইতিহাসের ধারায় একই স্রোত দুই হইয়া, আবার দুই স্রোত এক হইয়া যুগপৎ বহিয়া চলিয়াছে ;—মানুষ তাহার আপন মনে যাহা অনুভব করে, যাহা কল্পনা করে, যে ব্যথা পায়,—তাহাই ইতিহাসের ধারায় আসিয়া জমিয়া উঠে, বৃহৎ দেখায়—। আবার ইতিহাসের আদর্শ– তার হর্ষ ও বিষাদ, তার জয় ও পরাজয়, তার ত্যাগ ও দুঃখ, তার মান ও অপমান, সকলি পৃথকভাবে প্রতি মানুষের হৃদয়কে আঘাত করে, চেতনা দেয়, গড়িয়া তুলে, তাই মানুষের চিত্তের ও ইতিহাসের ধারা, অন্তর ও বাহির, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে ; কোন্ অকূলে, কোন্ শূন্যে,—কি ক্ষোভে, কি দুরাশায়–কে জানে ? দুইটি স্রোতের যেন একই লক্ষ্য, একই তৃষ্ণা ; একই বেগ, একই তরঙ্গ। সেই উঠা পড়া, সেই ভাঙ্গা গড়া, সেই বহে যাওয়া— ! বিভিন্ন জাতির সেই সংঘর্ষণ, সেই মিলন, উদ্দেশ্য সেই, উপায় ভিন্ন ; নাম ভিন্ন, ব্যাখ্যা ভিন্ন। মানুষে মানুষে সেই স্বার্থ— সেই দ্বন্দ্ব, আবার সেই মেলা মেশা ; এখানেও উপায় ভিন্ন, নাম ভিন্ন, ব্যাখ্যা ভিন্ন, অনুভূতিও কিঞ্চিৎ ভিন্ন ; কিন্তু উদ্দেশ্য সেই এক। ব্যক্তি, জাতি, বিশ্বমানব যেন সমস্তই এক অতি সর্ব্বগ্রাসী দুর্নিবার স্রোতে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে ! আবার দেখা যায়, মনে হয় যেন সবি সেই তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। যুগযুগান্তর কালের স্রোতে একের পর আর, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তার ক্ষণিক লীলাভিনয় সঙ্গে করিয়া কোন্ দূর অস্পষ্ট অন্ধকারে ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। সম্মুখে অন্ধকার, পশ্চাতে অন্ধকার, মাঝে এই আলেয়ার ক্ষণিক দীপ্তি, এই ইন্দ্রজাল –এই ছায়া বাজি। চিরকাল এই লীলা, এই খেলা। তবু যেন কিছুই হয় নাই,—সকলি ঠিক তেমনি—রহিয়াছে। ছায়াবাজির মত এই যে এক আসিতেছে আর যাইতেছে ইহা যেন সব ভুল ; যেন শুধু আমাদেরই দেখার দোষ। কিছুই যায় না, কিছুই আসে না। কোথায় যাইবে ? কোথা হইতেই বা আসিবে ? মানুষের সেই জন্ম সেই মৃত্যু,—সেই হাসি সেই অশ্রু,—

সেই ভুল সেই ভ্রান্তি,—সেই প্রেম—সেই দুঃখ,—সেই তৃষা সেই বিষ,—সেই স্মৃতি—সেই জ্বালা অনন্তকালের ধারা সমস্তই ভাসাইয়া নিতেছে ; কিন্তু যেন, সখি সেই, সখি সেই !

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

শ্রাবণে।

গগন আঁধার, ঝরে বারিধার জনহীন যমুনায় ;
এমন বাদলে, আঁখি ছলছলে সুগভীর বেদনায়।
কূলে কূলে জল, করে টলমল, চঞ্চল বহে বায় ;—
দুটি চোখ কার, অশ্রু-আঁধার, দেখিবারে নাহি পায়।

বাঁশরীর তান আকুলিছে প্রাণ, এখনো বাজিছে কাণে ;
তমালের তলে সে যে কুতূহলে দাঁড়াইত এইখানে।
কত না বরষা, পরাণ বিবশ, শ্রাবণের আঁধিয়ার,
হরষে সরস তনুটি অলস, মঞ্জু সে অভিসার—
মেঘ গুরু গুরু, হৃদি দুরু দুরু, সঘনে কাঁপিছে বালা ;
কুঞ্জ দুয়ারে এ চাহে উহারে এখনো এলনা কালা।
পলকে পলকে দামিনী ঝলকে, যমুনার কলরোল,
'হোথা শুনি কিবে !—বাঁশী কাঁদিছে, সখি সখি, ধরে' তোল'
— নিশি নিশি তাই কাঁদিয়াছে রাই, অবিরল বারিধার
আঁখি জল তার ফুরাল না আর, বরষা ভরসা সার !

সে কলরোদন অতুলবেদন ভোলেনি লহরী মালা,
আকাশে বাতাসে বিরহ হুতাশে কাঁদিছে ব্রজের বালা।
বাঁশী যেন কার ওই বার বার শোনা যায় সমীরণে,
সে যে কতদূর !—করিছে বিধুর—কি ছিল বঁধুর মনে !
কদম্ব আজ শিহরি সলাজ ফুটিয়াছে থরে থরে,
নব আনন্দে মদির গন্ধে তেমনি পাগল করে।

কেতকী কুতুকী, গুণ্ঠনমুখী, শ্বসিছে সুরভি শ্বাস,
আজিকে সকল, হয়েছে বিকল বরষা বরষ মাস।
শ্রাবণের রাতি, নিবিয়াছে বাতি নিখিল মানব ঘরে,
বাহির ভিতর ধারা-ঝর-ঝর আকুল মেঘের স্বরে।
একখানি ছবি, ভরিয়াছে সবি, শুধু তারি গান জাগে,
তাহারি বিরহ শুধু অহরহ পরাণে প্রবেশ মাগে।
যমুনার তীর, পবন অথির, মেঘ এলায়েছে বেণী,
একূলে ওকূলে শাখা দুলে দুলে গুমরে বনের শ্রেণী।
কূলে কূলে জল করে টল্‌মল্‌, উন্মদ বহে বায়,
দুটি চোখ কার অশ্রু আঁধার, দেখিবারে নাহি পায়।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

বীরভূমের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

মুসলমান শাসনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বীরভূম বহু বীরপুরুষের বীরত্বের লীলাভূমি ছিল। বীরভূম তৎকালে যথার্থই 'বীরভূমি' ছিল। বীরভূমের তৎকালীন জমিদারগণ প্রবল প্রতাপশালী ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহারা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড নিবাসী অসংখ্য প্রজাবৃন্দের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে জমিদারগণের যে কিরূপ প্রতাপ ছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। এ স্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্থানীয় জমিদার এবং শাসনকর্ত্তৃগণ সম্রাটের নিকট কর প্রদান ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।

এই সকল জমিদারগণের মধ্যে বীরভূমের জমিদারগণ সমধিক প্রতাপশালী এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবাব সরকারে তাঁহাদের প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। তাঁহাদের রাজধানী "নগর" বা "রাজনগর" পরিখা প্রাকার বেষ্টিত সুদৃঢ় নগর ছিল। অদ্যাবধি ভগ্ন অট্টালিকা স্তূপ নগরের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বীরভূমের যে সমস্ত বীরগণের নাম ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমরা এ প্রবন্ধে তাঁহাদেরই দুই এক জনের বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা করিব।

১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আজাআদ্দীন তোগন খাঁর রাজত্বকালে উড়িষ্যার রাজা বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। উড়িষ্যারাজ স্বয়ং গৌড়নগর অবরোধ করেন এবং বীরভূমের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী "নগর" আক্রমণ করিবার জন্য অন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। বীরভূমের তৎকালীন জমিদার করিম আদ্দীন স্বীয় স্বভাব সুলভ সাহসিকতার সহিত স্বকীয় মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া এই প্রবল সেনাদলের গতিরোধ করেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁহার এবং তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যের মৃত্যু হইলে উড়িষ্যাবাসিগণ নগর লুণ্ঠনে সক্ষম হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় ১৭০৭অব্দে যৎকালে মুর্শিদ কুলী জাফির খাঁ প্রতিনিধি নাজিম রূপে বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন তৎকালে বাঙ্গালার জমিদারগণ যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হওয়াতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে নিয়মিত রূপ করপ্রদান করিতেন না।

অনেকেই বা প্রকাশ্যে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করিতেন। মুর্শিদকুলি বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জমিদারগণের এ প্রভাব খণ্ডনে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি সৈয়দ এক্রাম খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। মেদিনীপুর পরগনার উড়িষ্যা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এক্রামখাঁর উপর আদেশ রহিল যে তিনি জমীদারগণের নিকট হইতে প্রাপ্য কর আদায়ে কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ না করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে হিন্দু জমিদারগণের উপর কর আদায়ের নামে অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত হইল। তিনি বঙ্গদেশের ভূমি সকল পুনর্ব্বার জরিপ করাইলেন এবং জমিদারগণকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত প্রাপ্য কর সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করিলেন।

বঙ্গদেশের তৎকালীন জমিদারগণের মধ্যে বীরভূম এবং বিষ্ণুপুরের জমিদারদ্বয় মুর্শিদকুলীর এ হঠকারিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা মুর্শিদাবাদ যাইতে অস্বীকার করিলেন এবং নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

বীরভূমের জমিদার আসাদ উল্লা আফগান বংশ সম্ভূত বীরপুরুষ। তিনি তাঁহার সৈন্যগণের সাহায্যে ঝাড়খণ্ডস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়বান, প্রজারঞ্জক, অতি ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি রাজস্বের অর্দ্ধেক ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিতেন এবং অপরার্দ্ধ প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে ব্যায়িত হইত। তিনি

অতিশয় বদান্য এবং সরল স্বভাব ছিলেন। তিনি নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাতে নবাব বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। একপক্ষে এরূপ ধার্ম্মিক জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সমগ্র প্রজা, বিশেষতঃ মুসলমান সমাজ তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিবেন এবং অপর পক্ষ তাঁহাকে দমন না করিলে অন্যান্য জমিদারগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মুর্শিদকুলীর সযত্নে সিঞ্চিত নিয়মাবলীর মূলে কুঠারাঘাত করিবেন। যাহা হউক নবাব অবশেষ এই মহাপ্রাণ জমিদারের সহিত যুদ্ধ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কর গ্রহণে স্বীকার করিলেন।

আসাদ উল্লার মৃত্যুর পর তৎপুত্র বদী-উল-জমান্ বীরভূমের জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাঁহার সময়ে মুর্শিদকুলীর জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুজাউদ্দীন অত্যন্ত বিলাসী এবং অলস হইয়া উঠিলেন এবং অধীনস্থ জমিদারগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে বদী-উল-জামান স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিলেন এবং নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু নবাব তাঁহার বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন।

বীরভূমের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বীরত্বের এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। কালের কঠোর শাসনে বীরভূমের শাসনকর্ত্তা সেই মুসলমান জমিদার বংশের আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রবলপ্রতাপ নাই। তাঁহাদের রাজধানী "নগরের" আর সে শ্রী নাই। তথাপি বীরভূম বীরত্বের গৌরবে গৌরবান্বিতা এবং যথার্থই বীরভূমি। *

শ্রীতুলসীদাস চক্রবর্ত্তী।

অজ্ঞাত।

সুনির্ম্মল আভাযুক্ত রত্নাবলী কত
অন্ধকার অতলিত সিন্ধু গর্ভে রয়,
অলক্ষ্যেত কত পুষ্প হয় প্রস্ফুটিত,
মরুভূ বাতাসে কিন্তু ঘ্রাণ লয় হয়।

(গ্রে।

---

* Sir Charles Stuart's History of Bengal হইতে।

আরোগ্য বিধান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি স্বরূপ কয়েকটি সূত্র অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সেগুলি এই—

১। যে বিদ্যা দ্বারা সুস্থ শরীরের নির্ম্মাণ (Structure) এবং ক্রিয়ার (Function) বিষয় অবগত হওয়া যায় তাহাকে শারীর-বিধান-বিদ্যাবলে—ইংরাজি নাম (Physiology)

যে সকল সূত্রবৎ উপাদান দ্বারা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাদিগকে বিধান তন্তু (Tissue) বলে। শরীরী জীবের জীবন রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ক্রিয়া সাধক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যথা (Liver, Lungs) ইত্যাদিকে যন্ত্র বা বিধান বলে (organ)। শরীরের বিধান তন্তুগুলি এরূপ-ভাবে প্রস্তুত যে উহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে ; এই বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের নাম সেই যন্ত্রের ক্রিয়া (function) যে শাস্ত্রে শরীরের সমগ্র যন্ত্রের এই বিশেষ ক্রিয়ার বিষয় বর্ণিত থাকে তাহাকেই শারীর বিধান শাস্ত্র কহে। এস্থলে এ টুকুও ভূমিকা আবশ্যক যে হিপো ক্রিটস (Hippocretes) আদি সর্ব্বজনের মতেই মানব দেহের উপাদান ত্রিবিধ।

(ক) দৃঢ় উপাদান যথা—অস্থি মাংস ইত্যাদি।

(খ) তরল উপাদান, যথা—শোণিত শ্লেষ্মা প্রভৃতি।

(গ) শক্তি—যাহাতে গতি উৎপন্ন করে।

সজীব দেহে জীবিত ও মৃত এই দুই প্রকার পদার্থ আছে। জীবিত পদার্থের নাম জীবন ধাতু (protoplasm) অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখা যায় যে শরীরের তন্তুবায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবরুদ্ধ কোষ সম্বলিত ইহাদিগকে অনুকোষ বলে (Cell) এই অনুকোষগুলিই প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের মূল উপাদান উহা হইতেই শরীরের সর্ব্ববিধ বিধান ও বিধানতন্তুর নির্ম্মাণ হইয়া থাকে—অনুকোষবর্গের বাহিরের স্তর কঠিন হইয়া যে আবরণ জন্মে তাহাকে অনুকোষ প্রাচীর বলে (cell wall) ইহার দুই প্রকার স্বাভাবিক শক্তি আছে—একটির নাম আকর্ষণী শক্তি (attractive power) অপরটির নাম নির্ব্বাচনী শক্তি (Selective power)। এই দুই শক্তির বলেই সর্ব্বশরীরের পরিপোষণ ও পরিবেষ্টনকারী তরল পদার্থ হইতে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সংগৃহীত হয়

অর্থাৎ কোথাও পিত্ত, কোথাও লালা কোথাও বা মূত্রাদি জন্মে। অনুকোষেই প্রকৃতপক্ষে জীবনের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। অনুকোষ স্বয়ং সজীব থাকে উপযুক্ত পরিপোষণ ও যথাযোগ্য উত্তাপ ভিন্ন অন্য কিছুর উপর উহার জীবন বা বৃদ্ধি নির্ভর করে না। এইরূপে যে পর্য্যন্ত না অনুকোষের জীবনকাল পরিসমাপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত উহা জীবিত থাকিয়া যথাযোগ্যভাবে আপনার নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে থাকে। যে তরল পদার্থ হইতে, অনুকোষের পরিপোষণ জন্মে সেই তরল পদার্থে যে যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আছে, সেইগুলি আকর্ষণ করিয়া লওয়াই অনুকোষের প্রধান ধর্ম্ম। অনেকগুলি পদার্থের মিশ্রণে এই তরল পদার্থ প্রস্তুত। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অনুকোষ উহার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আকর্ষণ ও গ্রহণ করে বলিয়া প্রতীত হয়। তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে অনু-কোষগুলির জাতি স্বতন্ত্র হইলেও উহাদের প্রাচীরের নির্ম্মাণ উপাদান সর্ব্বত্রই একরূপ। ইহার নাম (Protean)

২। কারণ সূত্র—যাহার দ্বারা অসুস্থাবস্থার নির্ম্মাণ ও ক্রিয়ার বিষয় ও রোগবিশেষের স্বাভাবিক ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যায়—ইহার ইংরাজি নাম (Pathology) এই তত্ত্ব দ্বিবিধ, সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ তত্ত্বে, সমস্ত রোগের সাধারণ কারণ, লক্ষণ নির্ণয় ও ভাবী ফল প্রভৃতি বর্ণিত হয়। কোনও বিশেষ রোগ বা শরীরের কোনও বিশেষ অঙ্গ বা স্থানের রোগের বিষয় বর্ণিত হয় না। যেমন প্রদাহ—প্রদাহ ফুসফুসে যকৃতে, মস্তিষ্কে ও শরীরের অন্যান্য স্থানেও হইতে পারে। সুতরাং এইটী সাধারণ।

এই সকল বলিবার আগে জীবন বা জীবনীশক্তির বিষয় কিছু বলা আবশ্যক এবং তাহার সহিত সুস্থাবস্থার ও পীড়িতাবস্থারও একটু জ্ঞান চাই। ভৌতিক দেহে আত্মার সংযোগ ঘটিলেই প্রাণী বলিয়া অভিহিত হয়, সুতরাং জীব বলিলে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি শরীরি মাত্রকেই বুঝায়। কিন্তু তাহা হইলেও মনুষ্য পরম কারুণিক জগদীশ্বরের নির্ম্মাণ কৌশলের উপযুক্ততম দৃষ্টান্ত। যে শক্তি দ্বারা জরায়ুক্ষেত্রে গর্ভ সংস্থানের প্রথমাবস্থা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্রমশঃ দেহের বৃদ্ধি ও নানাপ্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ হয় এবং যে শক্তির অভাব হইলে এই কৌশলময় দেহ সামান্য জড়পিণ্ডে পরিণত হয়, তাহাকেই জীবনীশক্তি বলে। ইহাই ইউরোপীয় মত। আর্য্য ঋষিগণ বলেন জীবনই আত্মা এবং কোনও কারণবশতঃ উক্ত আত্মা দেহ হইতে বিযুক্ত হইলেই মৃত্যু হয়। আবার কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন জীবনীশক্তি

জীবিতাবস্থায় ক্রিয়া সমষ্টির অপর নাম—উক্ত ক্রিয়া সকলের সহিত দেহের নির্ম্মাণ ও রাসায়নিক অবস্থার এবং বাহ্য বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে উহাদের উপর জীবনীশক্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করে। জীবন ধাতুর কথা আমরা শারীর বিধান বিস্তার উল্লেখে বলিয়াছি, ইহা জীবনীশক্তি দ্বারা পরিচালিত। জীবন ধাতুর ক্রিয়া দুই প্রকার, Metabolic ও Katabolic. এই ক্রিয়াদ্বয়ের বিকারেই রোগের উৎপত্তি। তরল পদার্থ হইতে যে আমরা শক্তি পাই এবং জীবন যে শক্তিময় এ কথা বিজ্ঞান সম্মত। যখন কোনও বিজাতীয় শত্রু, জীবনাংশকে আক্রমণ করে তখন পদার্থের গুণানুসারে সেই সংবাদ শরীরের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। তরল পদার্থের মধ্যবিন্দুতে আঘাত করিলে, সেই আঘাতজনিত কম্পন (vibration) পরিধি পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হয়—তখন জীবনীশক্তি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা যেন সাহায্য প্রার্থনা করে, সেই সকল চিহ্নকে আমরা জীবনের যন্ত্রণা বা রোগের লক্ষণ বলিয়া থাকি।

অতঃপর সমস্ত শরীরের নির্ম্মাণ ও ক্রিয়া সকল প্রকৃত অবস্থায় থাকিলে উহাকে সুস্থাবস্থা বলা যায়। অথবা কোনও প্রকার দুঃখজনক ক্রিয়া দেহে নিয়ত যুক্ত না থাকিলে যে অবস্থা অনুভূত হয় তাহার নাম স্বাস্থ্য কিন্তু এরূপ সুস্থাবস্থা প্রায় দেখা যায় না। যে অবস্থায় পরিশ্রম করা এবং পরিশ্রম জনিত ক্লেশ অল্প সময়ের মধ্যেই দূরীভূত হইয়া যায় মোটামুটি ইহা তাহাই। ঋষিগণ বলেন শরীরস্থ ধাতু সকলের সাম্যাবস্থাই স্বাস্থ্য ইহা সত্য হইলেও সুস্থাবস্থার সীমা আছে কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে যে পরিমাণ রক্ত থাকিলে দৈহিক ক্রিয়া অনায়াসে সম্পন্ন হয় তদপেক্ষা ন্যূন বা অধিক পরিমাণে রক্ত থাকিলে উক্ত কার্য্য সকল সেই রূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। পীড়িতাবস্থা সূক্ষ্ম রূপে নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর, কারণ শরীর ও মনের অবস্থা অতি সামান্য কারণেই রূপান্তরিত হয়। যথা সমান্য জ্বরে জ্বরে ত্যাগের সময় কখন কখন ঘর্ম্ম হয় এবং যক্ষ্মা রোগেও ঘর্ম্ম হয়। কিন্তু প্রথম কথিত ঘর্ম্ম শরীরের পক্ষে উপকারী এবং পশ্চাদুক্ত ঘর্ম্ম মৃত্যুর সাহায্যকারী। সুতরাং প্রথম কথিত ঘর্ম্মের অবস্থা পীড়িতাবস্থা নহে; শারীরিক পরিশ্রমের পর প্রভূত ঘর্ম্ম নির্গমের ন্যায় তাহা শরীরকে প্রকৃতিস্থ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনও কারণ বশতঃ ঐ ঘর্ম্মের পরিমাণ এত অধিক হয় যে শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে তাহা হইলেই রুগ্নাবস্থা, বস্তুত দেহের নির্ম্মাণ ও ক্রিয়ার স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং তাহাদের যথোপযুক্ত সামঞ্জস্যের ব্যতিক্রম হইলেই পীড়িতাবস্থা আখ্য ঋষিগণ

বলিয়াছেন প্রাণীতে দুঃখ সংযোগ হওয়াকে রোগ কহে অর্থাৎ যে কোন প্রকারে হউক প্রাণীতে ক্লেশের সঞ্চার হইলে সেই ক্লেশ যুক্ত অবস্থাকে পীড়িতাবস্থা বলা যায়। এই স্থানে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে স্বাভাবিক শরীরে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে সেই সময় যদি আহার না পাওয়া যায় তাহা হইলে যে ক্লেশ হইয়া থাকে তাহা রোগ কি না। কিন্তু সুশ্রুত মতে ক্ষুধা রোগ বলিয়া গণ্য হয়, তাঁহাদের মতে আগন্তুক শারীরিক মানসিক ও স্বাভাবিক ভেদে রোগ চারি প্রকার। মহর্ষিদিগের রোগ তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে হইলে শারীরিক বা মানসিক দুঃখই রোগ উহা ব্যতীত আর রোগ কিছুই নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে ঋষিদিগের বিরুদ্ধে বলিবার কোন কথা নাই। সুস্থ শরীরে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর যে সময় অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং স্বাস প্রশ্বাস প্রবল বেগে বহিতে থাকে তখন পরিশ্রান্ত ব্যক্তির অবশ্যই ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ক্লিষ্ট অবস্থাতে যদি পরিশ্রমের বিরাম না দেওয়া হয় তাহা হইলে শরীর ক্ষয় হয়। সুতরাং সেই অবস্থাকে রুগ্নাবস্থা বলিতে হইবে। উক্ত অবস্থা দূরী-করণার্থ পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত হওয়া ও আহার গ্রহণ করা এই দুইটী উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, এই দুইটী উপায় ঐ রোগের চিকিৎসা আধুনিক। ইউ-রোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে রোগ দ্বিবিধ। নির্ম্মাণ বিকার (Structural) ও ক্রিয়া বিকার (Functional) সচরাচর উভয়বিধ রোগ প্রায় একত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে নির্ম্মাণের পরিবর্ত্তন ব্যতীত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে, ক্রিয়া বিকার কেবল কাল্পনিক মাত্র সুতরাং আমাদের নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

(ক) কখন কখন নির্ম্মাণ বিকার সত্বেও ক্রিয়া বিকার হয় না।

(খ) সুস্থাবস্থার ক্রিয়ার আধিক্যে প্রবল রোগ হয়।

(গ) সুস্থাবস্থাতেও শরীরের প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া নির্ব্বাহ সময়ে নির্ম্মাণের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়।

৩। ঔষধ প্রয়োগবিদ্যা—যাহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রোগে নানাবিধ ঔষধের ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইয়া সেই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ নাশক স্বাভা-বিক শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া ব্যাধির শান্তি করিতে পারা যায়। ইহার ইংরাজী নাম Therapeutics। সরল ভাষায় রোগ প্রতিকারের নিমিত্ত যে যে দ্রব্য এবং যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা যায় তৎসমুদয়কে ঔষধ কহে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় জীব শরীরের রোগোৎপাদিকা ও রোগ নাশক শক্তির নামই ঔষধ।

প্রায় প্রত্যেক ঔষধের দুইটী ক্রিয়া মুখ্য (Direct) এবং গৌণ (Indirect) হোমিওপ্যাথিক মতের আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হানিমান বলেন প্রত্যেক ঔষধ, যাহা প্রথম জীবনী শক্তির উপর কার্য্য করে, অর্থাৎ সুস্থ শরীরে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটায়, তাহাকেই মুখ্য ক্রিয়া বলে এবং জীবনী শক্তি যখন স্বকীয় প্রভাবে তাহার ক্ষতি পূরণ চেষ্টা করে তাহাই গৌণ ক্রিয়া কোন কোন স্থলে মুখ্য ও গৌণ ক্রিয়াদ্বয় পরস্পর বিপরীত। হানিমানের মতে এই দুই ক্রিয়া পর্য্যায় ক্রিয়া ঔষধের ক্রিয়ার বা পীড়ার গতিই এই রূপ।

আরোগ্য বিধান্।

ডাক্তার হিউজ সাহেব বলেন "যতদিন পর্য্যন্ত শরীর বিধান, কারণ তত্ত্ব এবং ভৈষজ্য বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান নিশ্চিত ও সংশয় হীন না হইবে, ততদিন আমরা সদৃশ বিধান চিকিৎসার ঔষধের রোগ প্রশমিকা ক্রিয়ার কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারিনা, কেন না বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই পরিবর্ত্তন শীল।

তবে কতকগুলি মহাত্মার মত এ স্থলে উল্লেখ যোগ্য।

১। ডাক্তার জারষ্টেল অবিকৃত অঙ্গে বিকার উৎপাদন করিয়া বিকৃত অঙ্গের বিকার দূরীকরণ (Derivation) এই বিকার বিকৃত অঙ্গের যত নিকট-বর্ত্তী করা যায় তত শীঘ্র উপকার হয়, যেমন চক্ষু প্রদাহে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে Caustic না দিয়া Caustic লোশনে চক্ষু প্রক্ষালন করিলে সমধিক ফল পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথরা ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগে পীড়িত স্থানের অতি সন্নিকটে বিকার উৎপাদন সমর্থ। এখানে আমরা কতকগুলি বড় বড় বিজ্ঞানবিদের মতের উল্লেখ করিব।

হানিমান—দুইটি সদৃশ পীড়া এক সময়ে এক শরীরে থাকিতে পারে না। কারণ এইরূপ দুইটী সদৃশ পীড়ার মধ্যে প্রবলতরটি দুর্ব্বলকে বিনাশ করে অথবা দুর্ব্বল প্রবলের দ্বারা দূরীকৃত হয়। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক পীড়া প্রত্যে-কেই জীবনীশক্তির উপর কার্য্য করে। ঔষধ সেবনজনিত পীড়া স্বাভাবিক রোগের স্থান অধিকার করে। উহা প্রবলতর হইয়া স্বভাবজাত পীড়াকে বিদূরিত করে। পরন্তু ঔষধের ক্রিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব হেতু মনুষ্যশরীরে কৃত্রিম পীড়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। জীবনীশক্তি প্রভাবে উহা অবিলম্বে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্য পুনঃ ফিরিয়া আসে।

"In the living organism a weaker dynamic affection is

permanently Extinguished by a stronger one," if the latter is similar to the former in its manifestation

Organic Sec. xxvi

কচ—Koch সাহেব বলেন—"পীড়োৎপাদিকা শক্তি এবং পীড়া প্রবণতা শক্তি উভয়ে সদৃশ। ইহারা একত্র হইয়া পীড়ারূপে প্রকাশ পায়। পীড়ার লক্ষণ আর কিছুই নহে কেবল স্বেন্দ্রিয়করণ শক্তি ও জীবনীশক্তির তুমুল সংগ্রাম চিহ্ন—পীড়া চেষ্টা করে যে, কিসে তার স্বদল বৃদ্ধি করিবে, এদিকে জীবনী-শক্তি বাধা দেয়। ঔষধের শক্তির সহিত পীড়া প্রবণতা শক্তির সাদৃশ আছে। ঔষধ দ্বারা পীড়া প্রবণতা শক্তির বৃদ্ধি করিতে হয়।

Koch's morbific agent combines with the disposition to disease to which it is similar and from the union of the two, the desease is generated. The Symptoms are produced on the one hand, by the struggle of this so produced disease to assimilate the organic matter according to its own peculiar type and the other by the effort of organism to resist this assimilative faculty. Dudgeon.

শ্রীচারুশশী চট্টোপাধ্যায়।

শেষ।

কুলের গরিমা কিম্বা শক্তির বিকাশ,
সৌন্দর্য্যের রূপরাশি বিভবের সুখ,
সকলি প্রতীক্ষা করে কালের গরাস,—
গৌরবের পন্থা সব সমাধি-প্রমুখ।

(গ্রে)

ফুল ও প্রজাপতি।

(ভিক্টর হিউগোর অনুকরণে)

আমি অতি ক্ষুদ্র ফুল পড়িয়া ধরণী' পরে,—
হে সখা, যেয়োনা মোরে ফেলিয়া অবজ্ঞা ভরে!
তুমি এসে ভেসে যাও কনক-কিরণে চড়ি
শ্যামলে সমীরে নীলে, কত স্বপ্ন রাজ্য গড়ি!
ধূলায় লুটাই আমি, কীটদষ্ট মনপ্রাণ,
উৎসুক নয়নযুগ,—নিরদয় ব্যবধান!
হেরি দিনমান শুধু নিজ ছায়া পদতলে,
দীর্ঘ রাত্রি রহি' জাগি তিমিরে নয়ন জলে!
প্রভাতে চরণে ঝরি, ধৌত-হৃদি পরিমল,
কি দিয়ে বাঁধিব তোমা'—আছে শুধু অশ্রুজল!
কোথা প্রেমাতুর তান বসন্তের অনুরাগ,—
আছে শুধু জীর্ণ হাসি, হৃদয়ের রক্ত-রাগ!
হে সুদূর, হে সুন্দর, ওগো নীলাকাশ-চারি,
তোমারে হৃদয়ে ধরে, আর না রাখিতে পারি!
অসীম দিগন্তে লহ লহ তবে সাথে করে' ;—
জাগরণ পূর্ণ ধরা—আমি শুধু যাব ঝরে ?

শ্রীসুশীলকুমার দে।

ভাগবত ধর্ম্ম।

১। ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার।

(গতানুবৃত্তি)

মানুষের জীবনে একটা দ্বৈতভাব আছে। এক সময়ে সকলকেই এই দ্বৈতভাবের মধ্যে আসিতে হয়। যাঁহারা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্ম্মাবধরণ করিতে ও ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার নিরূপণ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এই দ্বৈতভাবের প্রকৃতি আলোচনা করিতে হইবে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই দ্বৈতভাব বড়ই সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন, সমস্ত পৃথিবীর রাজা, নিজের পুত্রের মত প্রজা-

পালন করিতেন, সকল দিকেই সুখ, জীবনে যে কিছু কঠিন সমস্যা আছে তাহা রাজা জানিতেন না। হঠাং বিদেশ হইতে এক দল শত্রু আসিয়া সুরথ রাজার রাজ্য আক্রমণ করিল। রাজা সংবাদ পাইয়া সৈন্যসহ রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। শত্রুরা অতি প্রবল, রাজা পরাস্ত হইয়া নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, শত্রুরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিল। রাজা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার নিজের দুষ্ট বুদ্ধি মন্ত্রীগণ তাঁহার হস্তী, অশ্ব রাষ্ট্র প্রভৃতি বল ও ধনাগার অপহরণ করিল। রাজা দেখিলেন সংসার কিছুই নহে, কাহাকেও বিশ্বাস করা যায় না, এতদিন যাহাদিগকে নিতান্ত আপনার বলিয়া জানিতাম আজ আমার অসময় দেখিয়া তাহারাও আমার বিপক্ষ হইল, আর কাহার জন্য সংসার করিব, আর কি আশায়, কি সুখে এই রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব? সমস্তই অসার সমস্তই অলীক। এই রূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, রাজা মনের কথা কাঁহাকেও কিছু খুলিয়া বলিলেন না, মৃগয়া করিতে যাইতেছি বলিয়া ছল করিয়া একাকী বনে গমন করিলেন।

কিছুদূর যাইয়া রাজা সুরথ, মেধস মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বেশ শান্তিময় তপোবন, হিংসা নাই দ্বেষ নাই, সংসারের কোলাহল নাই। মুনি রাজাকে বেশ আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, রাজাও মুনির আতিথ্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

সংসার ছাড়িয়া সুরথ রাজা শান্তিময় তপোবনে আসিলেন বটে কিন্তু প্রাণে শান্তি হইল না। তাঁহার মনে নানা রূপ দুর্ভাবনা উদয় হইতে লাগিল। রাজা ভাবিতেছেন হায় আমার সেই দুশ্চরিত্র ভৃত্যগণ, তাহাদের আমরাই পুরুষানুক্রমে পালন করিয়াছি। আজি আমি রাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহারা বোধ হয় ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতেছে না। আমার সেই হাতিটি আহা কত সুন্দর, তাহার যে মাহুত সেও বড় নিপুণ, শত্রুরা নিশ্চয়ই তাহাদের লইয়া গিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই খাইতে পাইতেছে না। কর্ম্মচারীগণ বোধ হয় আমোদে ও আলস্যে দিন কাটাইতেছে, অন্যায় রূপে টাকা কড়ি সমস্ত খরচ হইয়া যাইতেছে, আমরা বহু পুরুষ ধরিয়া অতিকষ্টে যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহারা অপরিমিত খরচ করিয়া হয়ত তাহা সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, এই প্রকারের নানা রূপ সাংসারিক চিন্তা রাজার মনে উদয় হইতে লাগিল।

রাজা সুরথ আশ্রমের নিকট ভ্রমণ করিতেছেন, আর এই রূপ ভাবিতেছেন এমন সময় তিনি দেখিলেন একটি লোক সেই দিকে আসিতেছে—লোকটি শোকান্বিত ও বিমনা। রাজা তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল—মহাশয় আমার নাম সমাধি আমি একজন বৈশ্য, আমি খুব ধনবান লোকের বংশে জন্মিয়াছিলাম। আমার সুখের ও অভাব ছিল না অর্থেরও অভাব ছিল না, বেশ সুখে দিন কাটাইতেছিলাম। এই প্রকারে বেশ সুখে ও নিরাপদে দিন কাটাইতে কাটাইতে, আমার দুর্ব্বৃত্ত পুত্র, ভার্য্যা ও পুত্রবধূগণ ধনলোভে আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল, তাহারা আমার টাকা কড়ি সমস্তই কাড়িয়া লইয়াছে—এই জন্য আমি মনের দুঃখে বনে চলিয়া আসিয়াছি। ভাবিয়া দেখিলাম সংসারে কেহই আপনার নহে, যখন আমি ধনী ছিলাম বাড়ীর কর্ত্তা ছিলাম তখন আমার বন্ধু মাতুল প্রভৃতি আমার সহিত কতই না আত্মীয়তা করিতেন, এমন ভাব দেখাইতেন যেন আমার জন্য তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু এখন দরিদ্র হইয়া দেখিলাম তাঁহাদের স্নেহ ও ভালবাসা সমস্তই মিথ্যা। এই দুঃসময়ে সাহায্য করা দূরের কথা একবার তাঁহারা মুখ তুলিয়া ও আমার প্রতি চাহিলেন না, আমি বড়ই দুঃখে বনে আসিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম সংসার ভুলিয়া বনে আসিয়া শান্তি পাইব, কিন্তু সংসার ভুলিতে পারিতেছি না, পুত্র, স্বজন পত্নী প্রভৃতির জন্য বড়ই ভাবনা হইতেছে। তাহারা সকলে কেমন আছে তাহাই ভাবিতেছি।

রাজা মনে মনে বুঝিলেন তাঁহাদের উভয়েরই অবস্থা এক রূপ। তথাপি ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা তোমার স্ত্রী পুত্র, তাহারাই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার এই দুরবস্থা করিয়াছে, তাহা তুমি সমস্তই জান, অথচ তুমি সেই সমস্ত বিশ্বাসঘাতক ও কপট স্ত্রী পুত্রাদির জন্য এত ব্যাকুল হইতেছ কেন।

বৈশ্য আর থাকিতে পারিল না তাহার মধ্যে যে দ্বৈতভাবের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহা বলিয়া ফেলিল। সে বলিল—

"তদেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেম প্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥

"মহামতে, আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য। আমি সবই জানি, অথচ জানিয়া ও জানিনা—বিশেষরূপে জানিয়াও একান্তভাবে বিজ্ঞানের ভূমি আশ্রয়

করিতে পারিতেছি না। বন্ধুগণ বিগুণ জানিয়াও চিত্ত তাহাদের প্রতি কেন যে প্রেমপ্রবণ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজা দেখিলেন উভয়েরই সমস্যা এক—উভয়েই জীবনের মধ্যে একটা দ্বৈতভাব দেখিতেছেন। হিসাব করিয়া চিন্তা করিয়া জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা কিছুই নয় বলিয়া বুঝিতে পারিতেছেন তাহা ছাড়িতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় রাজা বৈশ্যকে লইয়া মুনির নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের জীবনের ইতিহাস ও সমস্যা যথাযথ বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দুঃখায় যন্মে মনসো স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা।"

"মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিতে না পারায়, আমার যে দুঃখ হয় তাহার কারণ কি?"

"দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মনত্বাকৃষ্টমানসৌ।

"আমরা উভয়েই বিষয়ের দোষ অনুভব করিতেছি—অথচ আমাদের মন মমত্বে আকৃষ্ট হইতেছে।"

প্রশ্ন শুনিয়াই মুনি বুঝিলেন ইহাদের অধিকার হইয়াছে তখন তিনি সেই মহামায়া, যিনি বলিয়াছেন

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

"আমিই জগতে এক আমি ছাড়া আর জগতে দ্বিতীয় কিছুই নাই" সেই মহামায়ার তত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। এই মহামায়ার তত্ত্বই ব্রহ্মবিদ্যা। এই তত্ত্বের ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেই সকল সমস্যার শেষ হয়, বিশ্বের বিরোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে যে মহা ঐক্য ও সাম্য রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়াই ঋষি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন এবং শ্রোতৃদ্বয় ও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে এই ব্রহ্মবিদ্যার সুফল প্রাপ্ত হইলেন, নতুবা হাটে মাঠে ঘাটে যেখানে সেখানে এ তত্ত্ব প্রচার করিয়া কি হইবে?

যিনি জীবনের সমস্যা এখনও দেখিতে পান নাই, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগকারী যে মানবের মনে এক নিমেষের জন্য ও অতীন্দ্রিয় কোনও বিষয়ের একটা অস্পষ্ট ছায়াও জাগে নাই তাঁহার নিকট "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি কথা বলিয়া কি হইবে? মধুর বাটি জিহ্বার নিকটেই ধরিতে হইবে, অঙ্গুলি তাহার মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ডুবিয়া থাকিলেও তাহার স্বাদ বুঝিতে পারিবে না।

সুরথ রাজা ঋষিকে যে প্রশ্ন করিলেন তাহার একটি কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। রাজা বলিলেন "মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিতে না পারায় আমার যে দুঃখ হইতেছে, তাহার কারণ কি ?"

সমগ্র মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিবার উপায় শিক্ষা দিয়াছে। ভগবদ্গীতার সমস্যাও ঠিক তাহাই। ভগবদ্গীতার প্রারম্ভে অর্জ্জুনকে যে সমস্যার মধ্যে লইয়া আসা হইয়াছে, তাহার সহিত চণ্ডীর সুরথ রাজার সমস্যার মোটেই কোন প্রভেদ নাই। পূর্ব্বে যে দ্বৈতভাবের কথা বলা হইয়াছে, ভগবদ্গীতার প্রারম্ভে আমরা অর্জ্জুনকেও ঠিক সেই সমস্যার মধ্যে দেখিতে পাই। পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইয়া গিয়াছে যুদ্ধ করিতে হইবে— অর্জ্জুন রাজার পুত্র, তিনি ক্ষত্রিয়, দুষ্টকে দমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করাই অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম। এই পথ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য পথ, এই কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় অর্জ্জুনকে তাঁহার ব্যক্তিগত লাভ বা অলাভ সুখ বা দুঃখ, জয় বা পরাজয় কিছুকেই গ্রাহ্য করিতে হইবে না। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের আলোচনা একেবারে না করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বা যাহা ধর্ম্ম তাহা আশ্রয় করা নিতান্ত সহজ নহে। অর্জ্জুন যখন এই সুনিশ্চিত কর্ত্তব্যব্রত পালন করিতে যাইতেছেন তখন তাঁহার ব্যক্তিগত চিন্তাগুলি আসিয়া তাঁহার মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করিতেছে। অর্জ্জুন ভাবিতেছেন, যুদ্ধ করিতে ত আসিয়াছি কিন্তু স্বজনগণকে কেমন করিয়া বধ করিব ? যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজ্য পাইতে পারি, কিন্তু কাহাকে লইয়া সে রাজ্যভোগ করিব ? আত্মীয় বন্ধু সকলে যদি মরিয়াই গেল তবে রাজ্য পাইয়া লাভ কি ? এই প্রকারের চিন্তাই অর্জ্জুনের বিষাদের কারণ। এই বিষাদের মূলে আমরা দেখিতে পাই যে অর্জ্জুন যেন নিজেদের রাজ্য লাভ ও সুখের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, এই জ্ঞানটা তাঁহার মনে রহিয়াছে। যুক্তির অভাব কখনই হয় না, অর্জ্জুনেরও যুক্তি আছে, তিনি এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা যুদ্ধ না করাই যে সঙ্গত তাহা প্রমাণ করিতেছেন! গীতার অর্জ্জুন বিষাদ পাঠ করার সময় একটি কথা বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত। অর্জ্জুন যে সমস্ত যুক্তি দিতেছেন, সে যুক্তিগুলি প্রথমে আলোচনা করিয়া বেশ ধীরভাবে অর্জ্জুন তাঁহার যুদ্ধত্যাগের কর্ত্তব্যতা নিরূপণ করেন নাই—প্রথমেই অর্জ্জুনের অঙ্গ অবশ হইয়াছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িয়াছে, অন্তঃসন্তাপে চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে এইরূপ তাঁহার মনে হইতেছে, তিনি আর থাকিতে পারিতেছেন না, তাঁহার

মন যেন ঘুরিতেছে। এইরূপ যখন তাঁহার অবস্থা তখন অর্জ্জুন বলিতেছেন

"ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানিচ॥

"যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না, হে কৃষ্ণ আমি জয় ও চাহি ন রাজ্যও চাহিনা সুখও চাহিনা।"

অর্জ্জুনের যে অবস্থা সে অবস্থায় তাঁহার যাহা যথার্থ শ্রেয়ঃ তাহা নির্দ্ধারণ করিবার তাঁহার শক্তিই থাকিতে পারে না। গীতার পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে এই 'শ্রেয়ঃ' শব্দটির প্রয়োগের বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটি বিষয়ের তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন "তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ" অর্থাৎ যিনি ধীর তিনিই এদুটিকে সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন। কেবল যে বুঝিতে পারেন তাহা নহে "শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে" অর্থাৎ ধীর ব্যক্তি প্রেয়কে পরিহার করিয়া শ্রেয়ঃকেই বরণ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন এখন একেবারে অধীর, কিন্তু সে কথা তাঁহাকে বলে কে? তিনি যে অধীর তাহা তিনি জানেন না তাই নানারূপ যুক্তি দেখাইতেছেন। ইহা ছাড়া আর একটি কথা আছে। অর্জ্জুন দুটানাটানির মধ্যে পড়িয়াছেন, যতক্ষণ অধীর হইয়াও তিনি নিজেকে ধীর বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন ততক্ষণ ভগবান তাঁহাকে বিশেষ কিছু বলেন নাই, কিন্তু একটির পর আর একটি যুক্তি দিতে দিতে অর্জ্জুন যেন নিজের অক্ষমতার ও অধীরতার সামান্য অভাস পাইলেন, তাই তিনি বিস্ময়ের সহিত ভগবানকে বলিলেন

"কার্পণ্য দোষোপ হতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সমূঢ়চেতাঃ
যচ্ছ্রেয় স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

এই শ্লোকের টীকায় সুপ্রসিদ্ধ আনন্দ গিরি বলিতেছেন "যঃ স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন সহতে স কৃপণঃ" অর্থৎ যিনি সামান্য মাত্রও নিজের ক্ষতি সহিতে না পারেন তিনি কৃপণ, অর্জ্জুন বলিতেছেন—"গুরু ও আত্মীয় বন্ধুগণকে বধ করিয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, চিত্তের এইরূপ দীনতা ও কুলক্ষয় জনিত পাপ এই উভয় আলোচনায় আমার প্রকৃতি অভিভূত হইয়াছে। আমি বিমূঢ় চিত্ত হইয়া পড়িয়াছি, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নিরূপণে আমার শক্তি নাই। আমি

তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমার যাহা শ্রেয়ঃ তাহা তুমি নিশ্চয় করিয়া বল।"

কেন অর্জ্জুন এই মাত্রইত তুমি বলিতেছিলে ইহাই তোমার শ্রেয়ঃ, এই মাত্রই দেখিলাম তোমার জ্ঞানে তুমি সন্তুষ্ট ছিলে, আবার এ কি কথা বলিতেছ?

এই শেষ কথাটি যখন অর্জ্জুন বলিলেন তখনই তাঁহার ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার হইল, তখন ভগবান হাসিতে হাসিতে অর্জ্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। যোগ বাশিষ্ট রামায়ণে জিজ্ঞাসু শ্রীরামচন্দ্রের মানসিক অবস্থার যে বর্ণনা আছে তাহা ও পূর্ব্বোক্ত অবস্থা গুলির সহিত তুলনীয়।

মোটামুটি এক কথায় দাঁড়াইল এই যে মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগতের বিষয় সমূহ উপভোগ করিতেছে, যতক্ষণ এই বিষয়ভোগের মধ্যে মনুষ্য আত্মহারা. বিষয়ের উর্দ্ধে ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধে আর কিছু আছে বা থাকিতে পারে এ কথা যখন মানুষের মনে স্বপ্ন ও জাগ্রত হয় না সে সময়ে তাহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করা একেবারেই বিড়ম্বনা। এই প্রকারের ইন্দ্রিয় সর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণনা করিলে কি ফল হইবে তাহা গীতা এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন—
মাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈবচান্যঃ
আশ্চর্য্য বচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদন চৈব কশ্চিৎ।"

"কেহ কেহ শাস্ত্র হইতে বা গুরু মুখে ইহা জানিয়াও আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ করেন। কেহ বা ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ কহেন। কেহ বা ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেনা কেহ বা শুনিয়াও ইহাকে মানেন না।

ইংরাজি কবি টেনিসন্ বলিয়াছেন

"There lives more faith in honest doubt
Believe me than in half the creeds."

সাধু সংশয়ের মধ্যে যে ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে, অন্ধভাবে ধর্ম্মমত গ্রহণ করায় তাহা নাই।" এই যে সাধু সংশয় স্থূল ভাবে দেখিতে গেলে ইহাই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারের ভিত্তি।

মাসিক সাহিত্য-আলোচনা।

প্রবাসী।—আষাঢ়। 'গীতাপাঠের ভূমিকা' শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বর্ত্তমান সংখ্যায় যেটুকু বাহির হইয়াছে তাহাতে কয়েকটি বেশ মৌলিক সিদ্ধান্ত পরিদৃষ্ট হয়। ত্রেতাযুগে সমাজ ব্রাহ্মণত্বের অভিমুখী ছিল। রাজা জনক ও দশরথ এক রূপ ব্রাহ্মণ ভাবাপন্ন, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র তপস্যা প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইলেন, ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয় সংহার করিলেন। 'অযোধ্যাপুরী ব্রাহ্মণদিগের বেদাধ্যয়নে ত্রিসন্ধ্যা শব্দায়মান—সে মহাপুরীতে ক্ষত্রিয় বীরদিগের ধনুষ্টঙ্কারের কোনো সাড়াশব্দ নাই। দ্বাপরযুগে বা মহাভারতের চিত্রে সমাজ ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমুখী। মতটি মৌলিক ও মূল্যবান—এই সঙ্গে আমরা বলিতে পারি কলিতে সমাজ বৈশ্যত্বের অভিমুখী। লেখক বলিতেছেন সাংখ্য-বেদান্তের একটা ঐক্য আছে তাহা অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত। এই স্থানে লেখক 'নব্যহেগেলীয়' দার্শনিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। পরক্ষণেই বলিতেছেন গীতায় যে সমস্ত সার সার কথা আছে তাহা তর্কের অতীত শ্রদ্ধার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। এই স্থলে তিনি আত্ম প্রত্যয়বাদ বা Intutional School এর মত ধরিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদে এক সম্প্রদায় সাধকের জন্য (বিদেহ প্রকৃতি লয়াতিরিক্তানাং ;) বিশেষ এক প্রকার সমাধির (অসম্প্রজ্ঞাত) যে পঞ্চ সাধন অর্থাৎ শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে এই প্রবন্ধে তাহা সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রবন্ধে আছে প্রজ্ঞা হইলেই আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যাইবে কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে ব্যভাষ্যকার ধর্ম্ম সাধনাকে অতটা সুলভ না করিয়া বলিয়াছেন প্রজ্ঞা হইতে বিবেক—'তদভ্যাসাৎ তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাৎ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি।'

'বাঙ্গলা ব্যাকরণের তির্য্যক রূপ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গৌড়ীয় ভাষায় শব্দকে আড় করিয়া বলিবার একটা প্রথা আছে। যেমন বাপা, ভায়া (ভাইয়া) চাঁদা, লেজা, ছাগলা ইত্যাদি। এই বিকৃত রূপের ইংরাজী নাম oblique form বাংলায় তির্য্যক্ রূপ। প্রবন্ধটি গবেষণাপূর্ণ তবে অধিকাংশ উপপত্তিতেই মতভেদ হইবে।

"নির্ব্বাণ—শাক্যসিংহের ধর্ম্ম'।—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ। শিক্ষাপ্রদ ও সুলিখিত প্রবন্ধ। "অজ্ঞ জনেরা বলেন,—নির্ব্বাণ মানে দীপ নির্ব্বাণের মত আত্মার নির্ব্বাণ। তাহা নহে।" "নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ দুঃখের নির্ব্বাণ,

অশান্তি নাশ; পূর্ণ সুখোদয়,—দুঃখের চির-সমাধি।” বুদ্ধদেবের মতে “দুঃখের মূলে বাসনা, বাসনা হইতে কর্ম্ম। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফল। কর্ম্মফল হইতে দুঃখ।” বাসনা বর্জ্জনই নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র উপায়। লেখক দেখাইয়াছেন ‘উপনিষদে যে জীবনের আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই পরাকাষ্ঠা বুদ্ধেতে।’ অর্থাৎ বুদ্ধদেব হিন্দু জাতির প্রাচীন আধ্যাত্ম সাধনার একটি স্বাভাবিক ফল—বুদ্ধদেবের উদ্ভব ভারতবর্ষে একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। লেখক আরও দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধদেবের সাধনা হিন্দুর দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে ইহা বিদ্যমান। লেখকের মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ শব্দ হইতেই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। বৌদ্ধযুগ ও বৌদ্ধ সাধনা জগতের ইতিহাসে অত্যন্ত গৌরবের বস্তু। ইহার সহিত হিন্দু পৃথক নহে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিরোধ প্রমাণ করিয়া হিন্দুর জাতীয় গৌরব খর্ব্ব করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। অনেক দেশীয় লেখকও অন্ধভাবে তাহাদের মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার Christainiti and Vaishnavism” নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যুক্তির অসারতা প্রতিপাদন করিয়া দেখাইয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে হিন্দুর নিজস্ব। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্রজেন্দ্রবাবুর পথানুসরণ করিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে ও বৌদ্ধ সাধনা জাজ্জ্বল্যমান। জাতীয় গৌরবের যথার্থ ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই প্রকারের প্রবন্ধের বিশেষ প্রয়োজন।

‘রবীন্দ্রনাথ’ অতি দীর্ঘ প্রবন্ধ—শ্রীঅজিত কুমার চক্রবর্ত্তী—শেষ হইলে আলোচ্য। ‘গারোজাতির বিবরণ’ শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী—জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। ‘আসামী ভাষা’ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। যোগেশ বাবুর নূতন বানান পদ্ধতির মধ্য দিয়া এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের ভিতর প্রবেশ করিতে সাধারণ পাঠকগণ সম্মত হইবেন না। ‘জয়পুর প্রবাসী বাঙ্গালী’ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিত। জয়পুর কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বি,এ, মহাশয় গত জানুয়ারী মাস পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ভাটপাড়ার পণ্ডিত কুলে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাদান-কার্য্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শীতা ছিল। তিনি এডুকেশন গেজেটে মিশর পারস্য, গ্রীস, মীডিয়া প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। জয়পুরে আসিবার পর তিনি স্থানীয়

অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে গভীর গবেষণা-বর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শব্দ-সমালোচন নামে বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত পারস্য ও আরবী শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ তিনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন। "আর্য্য-নারী-গাথা"নামক তৎপ্রণীত ভারতীয় বীরনারী-গণের উদ্দীপনাপূর্ণ কাব্যময় ইতিহাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য! তিনি কয়েক-খানি বিদ্যালয় পাঠ্য হিন্দু পুস্তক ইতিহাস ও গণিত) রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মেঘনাথ বাবুর জন্ম হয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার একতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত "বিক্রমপুরের 'বাউলিয়া' বৃক্ষ"—বিক্রমপুরের অন্তর্গত হলদিয়া গ্রামের সীমান্তে একটি প্রাচীন হিজলগাছ আছে। গাছটি বড়ই আশ্চর্য্য—এই প্রবন্ধে সেই গাছটির চিত্র ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

'পতিব্রতা'—প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসু সতীর দক্ষযজ্ঞে দেহ ত্যাগ অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। "ইতিহাস বিজ্ঞান ও মানব জাতির আশা।" শ্রীবিনয়কুমার সরকার লিখিত পাণ্ডিত্য পূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ ময়মন-সিংহ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত। "প্রাণী বিজ্ঞানই প্রকৃত ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই মানবজীবনের গতি, মানব সমাজের ক্রমবিকাশ, মানব চিত্তের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট ও নিশ্চিত হইতে পারিবে।" যেমন জীবের জীবন ধারণ ও বংশ বিস্তার বেষ্টনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তেমনি প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতের প্রতিকূল ও অনুকূল উপকরণের মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার ফলেই মানবের বিকাশ পুষ্টি ও স্বাধীনতা।" "মানব সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক জাতির উৎকর্ষ অনুৎকর্ষ সমগ্র মানবেতি-হাসের পরিণতির গৌণ লক্ষণ ও পরিচয়।" বিভিন্ন দেশের ইতিহাস হইতে লেখক উদাহরণ দিয়া এই সমস্ত তথ্য বুঝাইয়াছেন। এরূপ চিন্তা পূর্ণ প্রবন্ধ বঙ্গ সাহিত্যে আজকাল কমিয়া যাইতেছে।

সাহিত্য।—আষাঢ় ১৮১৮। ভারতে শক-শোণিত" শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর লিখিত। "আমাদের শাস্ত্রানুসারে শকজাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়" পাশ্চাত্য মতে তাহারা 'মোঙ্গোলীয় প্রদেশের আদিম অধিবাসী।' টড্ সাহেবের মতে

রাজপুতগণ শক বংশোৎপন্ন কাউয়েল সাহেব এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, রিজলি সাহেবের মতে রাজপুত ও জাঠ জাতি শক-বংশোৎপন্ন নহে, মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরাই শকজাতি হইতে উৎপন্ন। রিজলি সাহেবের মতে মহারাষ্ট্র জাতি শক ও দ্রাবিড়ের সংমিশ্রণে আর অধিকাংশ বাঙ্গলীই দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতীয় সংমিশ্রণে উৎপন্ন। রিজলি সাহেব এদেশের নানা স্থানের লোকের মস্তক, নাসিকা ও দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত তথ্যে উপনীত হইয়াছেন। লেখক রিজলি সাহেবের মত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, অল্প সংখ্যক 'লোকের দৈহিক বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া সেই সেই জাতির মূল বংশ নির্ণয়ে যত্ন প্রকাশ কি দুঃসাহসের কার্য্য নহে!" লেখক নিজের এই উক্তির পোষকতায় সিবিলিয়ান্ ক্রুক সাহেবের মতবাদ উদ্ধার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মতের দ্বারা অন্ধভাবে চালিত না হইয়া স্বাধীনভাবে সকল দিক দেখিয়াই সিদ্ধান্ত বিশেষে উপনীত হইতে হয়, লেখক এই প্রবন্ধে তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধটিকে বিশেষরূপেই মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করি।

'জীববন্ধন'—শ্রীশশধর রায়—জীব ও জড়, এক বন্ধন-সূত্রেই আবদ্ধ। এ বন্ধন-সূত্র কোথাও ছিন্ন হইলে প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেবের গ্রন্থ হইতে বিবিধ উদাহরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক লেখক দেখাইতেছেন 'একটি চড়াই পাখী খসিয়া পড়িলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হইয়া উঠে। এই মহাজনবাণী গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সামঞ্জস্য নষ্ট হইলে যে বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তাহার ফল অনেক সময়েই আমরা বুঝিতে পারি না।' কাঠবিড়াল মারিলে কাঠঠোক্‌রার উপদ্রব বাড়ে, জঙ্গল কাটিলে বৃষ্টিপাত কম হয়—এক গ্রামে বাঘ মারায় কুকুরের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছিল, পতঙ্গ কমিলে গাছ আর ফুলে ফলে শোভিত হইবে না প্রভৃতি হইতে দেখা যায় সকল প্রাণীর এমন কি সকল উদ্ভিদের একটা বিশেষ উপযোগীতা আছে। এই আলোচনা হইতে সহজেই প্রশ্ন হয় জীবগণের প্রতি আমাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে? অনেক স্থলে তাহাদের নষ্ট না করিলেও নয় আবার নষ্ট করিলে অন্য দিকে বিপর্য্যয়। লেখকের মতে "তস্মাদযজ্ঞে বধোহবধঃ" হিন্দু শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। এই প্রকারের মধ্যপথই আমাদের অবলম্বনীয়। "বঙ্কিমপ্রসঙ্গ" শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই। "ব্যাকরণ বিভীষিকা" প্রবন্ধের লেখক উপসংহারে বলিতেছেন 'বাঙ্গা-

লার ধাত (genius) অবশ্য সংস্কৃতের ধাতের সঙ্গে ঠিক এক নহে। অতএব অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগে প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া যে কথা বার্ত্তায় প্রচলিত অশুদ্ধ পদ মাত্রই সাহিত্যের ভাষায় চালাইতে হইবে, ইহা ঠিক নহে।”

প্রবন্ধটিতে অনেক শিখিবার জিনিস আছে। ‘পিতৃদ্রোহী’ গল্প শ্রীসরোজ নাথ ঘোষ। ছাত্র জীবনে বড় বড় কথা বলা যায় কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ বড় একটা হয় না। কলেজে পড়িবার সময় উমাকান্ত নিজে বড় বড় কথা বলিত না কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে যে মহত্ব দেখাইল তাহা খুবই দুর্ল্লভ। উমাকান্তের পিতা তাঁহার বৈবাহিককে পণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উমাকান্তের বিবাহ দিলেন, বিবাহের পর বর যখন বাড়ী ফিরিবে তখন উমাকান্ত আর বাড়ী যাইতে চাহে না সে বলিল “বাবা আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইবার ন্যায় সঙ্গত অধিকার আমার নাই।” বলা বাহুল্য পুত্রেরই জয় হইল। পুত্রের অর্থলিপ্সু পিতা কন্যা কর্ত্তাকে পণের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হইলেন। সহযোগী সাহিত্যে জাপানের রাজনীতিক উন্মেষ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে গত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মিকাডো স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিলেন পাঁচ সাত বৎসর পরে অভিজাতবর্গ তাঁহাদে অধিকৃত ভূমি সম্পত্তি ও আড়াই হাজার বৎসরের সঞ্চিত প্রত্যেক পরিবারের ধনৈশ্বর্য্য যথা-সর্ব্বস্ব, জাতির মঙ্গলকামী হইয়া, ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সমাজগত ও বংশগত মান মর্য্যাদাও ত্যাগ করিলেন—এই ত্যাগের ফলেই জাপানেরা উন্নতি। মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় যে কয়টি উদারতা ও সাহানুভূতি পূর্ণ কথা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। কথা কয়টি এই “কলিকাতার দুই একজন মদদৃপ্ত কূপমণ্ডুক সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রকাশিত দুই একখানি মাসিক পত্রের সমালোচনায় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন।—অনুশুভদ্বেশ উন্নতির পরিপন্থী। বিদ্বেষের ফল-বিচ্ছেদ ও উচ্ছেদ। কিন্তু শনিকে বুঝাইয়া বলিলেও তিনি গণেশের কম-দেহে দৃষ্টি দিতে ছাড়িতেন না।” দুইটি সুন্দর বিদেশী গল্পের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে ও গল্প দুইটি কাহার রচনার অনুবাদ তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ‘প্রভাত ও শুকতারা’ ও ‘গুঞ্জন’ নামক দুইখানি সুন্দর চিত্র আছে এবং চিত্র দুইটির পরিচয়ও আছে।

The Dawn and Dawn Society's Magazine—June 1911. প্রবন্ধ গৌরবে এই ইংরাজী মাসিক পত্র খানি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। ইহার প্রবন্ধগুলি সমস্তই সময়োপযোগী ও গবেষণা পূর্ণ। প্রথম প্রবন্ধ 'উত্তর ভারতের সভ্যতা' লেখক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। লেখক এই প্রবন্ধে দেখাইতেছেন যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি সমাজ তাহাদের ভিন্ন প্রকারের সাধনা ও সভ্যতা লইয়া একত্রে ভারতবর্ষে অবস্থান নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়ে কি সুন্দর ঐক্য লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি প্রথমতঃ দেখাইতেছেন সঙ্গীত বিদ্যা—ইমন কল্যাণ একটি রাগিনীর নাম ইমন পারস্ত রাগ আর কল্যাণ ভারতবর্ষীয়। হিন্দু মুসলমান ওস্তাদের শিষ্য হয় আবার মুসলমান হিন্দু ওস্তাদের শিষ্য হয়। হিন্দু রাজা বা ধনী ব্যক্তির সভায় মুসলমান ওস্তাদ আবার মুসলমান নবাব বা ধনী ব্যক্তির অশ্রয়ে হিন্দু ওস্তাদ চিরদিনই তুল্যরূপ আদর লাভ করিতেছে। একই সঙ্গীত-সভায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়বিধ বাদ্যযন্ত্র একত্রে বাদিত হয়। হিন্দু ওস্তাদ মুসলমানদিগের ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতেছে আবার মুসলমান ওস্তাদ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গাহিতেছে—কোনরূপ ভেদ নাই।

তানসেন, কবির, নানক প্রভৃতির রচিত সঙ্গীতে এই মিলন আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। গ্রাম্য নহবৎ বা রোশনচৌকির বাজনা, শ্রাবণ মাসে গীত 'কাজ্‌রি' গানে এই ঐক্য দৃষ্ট হয়। অধিক কি উত্তর ভারতের মুসলমান রমণীগণ শিশুর জন্মের পর যে সমস্ত গান গাহিয়া থাকেন তাহার অধিকাংশই হিন্দু সাধনায় উদ্ভুত—উদাহরণ স্বরূপে দুইটি গান দেওয়া হইয়াছে—

১। আলবেলি যাচা মান করে নন্দলাল সে।
সোহাগন্‌ যাচা মান করা নন্দলাল সে।

২। আলবেলি নে মুঝে দরদ্‌ দিয়া
সান্‌ওয়ালিয়া নে মুঝে দরদ দিয়া।

'সান্‌ওয়ালিয়া' = শ্যামলিয়া = কৃষ্ণ।

উত্তর ভারতে বিশেষতঃ পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রবাদ গল্প প্রভৃতিও অতি সুন্দর ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। সাহিত্যে এমন কি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে পর্য্যন্ত এই ঐক্য কিরূপ তাহা লেখক প্রদর্শন করিয়াছেন। আজকালকার দিনে আমাদের এই ঐক্যের দিকটা যতই আলোচিত হয় ততই মঙ্গল। আমরা লেখক মহাশয়কে এই প্রবন্ধ বাঙ্গালায় লিখিয়া দেশবাসী-

গণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে ও মাতৃভাষার পুষ্টি-সাধন করিতে অনুরোধ করি। ভারতবর্ষের দেশীয়রাজ্য সমূহের মধ্যে বরদা রাজ্যের 'কলাভবন' সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তক্ষশালা (Technical Institution) দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই কলাভবনের ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে 'হিন্দুকে' ? ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এই প্রবন্ধে লেখক একটি অতীব মূল্যবান বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম এক্ষণে রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্ত যে মুসলমানগণ ঐক্যবন্ধনের জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন ইহার ফল কি হইবে ? ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানগণই এজন্ত চেষ্টা করিতেছেন—ইহার ফলে মুসলমান ধর্ম্মের পবিত্র ও উন্নত আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইবে। লেখকের নিজের কথা এই—"Spiritual Islam is thus being silently undermined, because a new idea, the idea of making it work as a great force to subserve the purposes of politics, as the west understands politics, has got hold of the public mind of Islamic India. But if this be so and if Islam forgetful of its own high ideals should enter into partnership with the forces making for the complete secularisation of life, on the basis of a consideration of worldly gain and loss, of worldly advantage and disadvantage, then she would have sounded her death-knell as a religion with the high function of laying down laws for the conduct and guidance of men and women with a view to help them in coming into vital relationship with the Supreme God and all that belongs to Him." টীকা নিস্প্রয়োজন। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও মূল্যবান।

দেবালয়।—বৈশাখ ১৩১৮—'চারি কন্তা' কবিতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের রচনা। বেশ হৃদয়গ্রাহী। 'কর্ম্মযোগ' শ্রীহরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বিশেষত্ব হীন। 'বিশ্বজনীন প্রেম' শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা—বিশ্ব পিতার উপলব্ধিতে ইহার পূর্ণতা। লেখক বলিতেছেন—"গুণাগুণের বাঁধ, অবস্থার বাঁধ, জাতিত্বের বাঁধ, সম্প্রদায়ের বাঁধ, সর্ব্ব প্রকার বাঁধ উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রেমের প্রবাহ ছুটিল।" শ্রীযুক্ত গিরিজা-

শঙ্কর রায় চৌধুরী লিখিত "হিন্দু ও গ্রীক" বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ। জার্ম্মান দার্শনিক হেগেল ইউরোপে মানবসভ্যতার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেন, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের এই ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সভ্যতার আর বাঁচিয়া থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই—তাহা হইলে আমাদের এই আত্মরক্ষার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ ও মনীষি ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেল দর্শনের এই ভ্রান্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের ইউরোপীয় খ্যাতির ইহাই অন্যতম কারণ। এই প্রবন্ধে সেই নূতন তথ্য, যাহার উপর আমাদের জাতীয় চেষ্টার একমাত্র যুক্তিযুক্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা দার্শনিক রাজ্যে অপ্রবিষ্ট তাঁহারা প্রবন্ধটির মূল্য নিরূপণ করিতে পারিবেন না।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা—জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 'হিন্দু ও পৌত্তলিকতা' নামক প্রবন্ধ শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিত। প্রবন্ধটি ১২৯১ সালের কার্ত্তিক মাসের নবজীবনে প্রকাশিত 'তেত্রিশ কোটি দেবতা, নামক প্রবন্ধ হইতে লওয়া হইয়াছে। ভাষা ও ভাব প্রায় সমস্তই চুরি। বড়ই দুঃখের বিষয়।

'উদ্বাহে উদ্বন্ধন' সময়োপযোগী গল্প সুপাঠ্য শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা—লিখিত।" কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন" প্রবন্ধের নামটি পড়িয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম, মধুসূদনের কবিতায় যেটুকু ক্ষত্রিয়-ভাব প্রকাশিত হইয়াছে লেখক তাহারই উপর বিশেষ জোর দিবেন।

কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহা বিশেষত্বহীন সাধারণ প্রবন্ধ। স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ে স্মৃতিলিপি উন্মোচন উপলক্ষে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় যে কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কবিতাটি বেশ আমরাও বলিতে পারি—

আনন্দমোহন

মাতৃভূমি বঙ্গভূমি, আচ্ছাদিয়া আছ তুমি
নীল গগনের মত করি আলিঙ্গন—
অবিরত নিশিদিবা, বিপদে বিভ্রাটে কিবা,
তুমি সে নয়নে জ্যোতি নিঃশ্বাসে পবন।

আমরা জ্যৈষ্ঠের কায়স্থ পত্রিকা, প্রতিভা, কোহিনূর, হিন্দুসখা, সমাজ প্রাপ্ত হইয়াছি। স্থানাভাব বশতঃ আলোচনা করিতে পারিলাম না তজ্জন্ত বিনীত ভাবে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

বঙ্গীয়

সাহিত্য-সেবক

বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের
বর্ণানুক্রমিক

সচিত্র চরিতাভিধান।

শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত।

সিউড়ি, বীরভূম, এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।
দীর্ঘ ভূমিকা ও বিশদ পরিশিষ্ট সমেত প্রাচীন ও অধুনা পরলোকগত
যাবতীয় (চতুর্দ্দশ শতাধিক) বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের সুন্দর হাফ্-
টোন চিত্র সম্বলিত বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান এই প্রথম প্রকা-
শিত হইল। ডিঃ ৮ পেজী, ৫ ফর্ম্মা বা ৪০ পৃঃ আকারে
অনুমান ২০ খণ্ডে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে। ছাপা, কাগজ
ও চিত্র সুন্দর। কি সুধীসমাজ, কি সংবাদ পত্র,
সর্ব্বত্রই বহুল প্রশংসিত। ১১শ খণ্ড প্রকা-
শিত হইয়াছে; অবশিষ্ট খণ্ডগুলি
যন্ত্রস্থ—অতি শীঘ্র প্রকাশিত
হইবে। সমগ্র গ্রন্থের
অগ্রিম মূল্য ৪৷৷০
টাকা; পরে
মূল্যবৃদ্ধি
হইবে।

৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্যযন্ত্রে, [illegible] মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

১ম বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩১৮। [১০ম সংখ্যা।

(নবপর্য্যায়)

সম্পাদক

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ।

বীরভূম-সাহিত্য-পরিষৎ।

বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকগণ।

১৩১৭।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমার রামেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর।

সহ-সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত কুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, হেতমপুর; শ্রীযুক্ত নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর; শ্রীযুক্ত কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায় বি, এল, সরকারী উকীল, সিউড়ি; শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, সিউড়ি; শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, সুলতানপুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মিশ্র বি, এল, উকীল।

সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, সব ডেপুটী কালেক্টর, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র; শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ (মাসিক পত্রের সম্পাদক)

ধন রক্ষক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, জমিদার ও উকিল সিউড়ি;

গ্রন্থ রক্ষক—শ্রীযুক্ত শিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল।

আয় ব্যয় পরীক্ষকগণ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভৌমিক এম, এ, বি, এল, উকীল; শ্রীযুক্ত লালা মৃত্যুঞ্জয় লাল বি, এল, উকীল।

ছাত্র-সভা পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

পুথি সংগ্রাহক ও মাসিক পত্রের এজেণ্ট শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়।

এতদতিরিক্ত নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য—

শ্রীযুক্ত যুগলবিহারী মাকড় এম, এ, বি, এল, উকীল, রামপুরহাট; শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু এম, এ, বি, এল. উকীল, বোলপুর; শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ বি, এল, উকীল বোলপুর; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল, দুবরাজপুর; শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন চৌধুরী বি, এল, সিউড়ি, শ্রীযুক্ত চারুশশী চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস্, সিউড়ি; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী 'বীরভূমবার্ত্তা'র সম্পাদক সিউড়ি; খান বাহাদুর মৌলভী সামসুজ্জোহা বি, এ, জমিদার, সেকেড্ডা; শ্রীযুক্ত রাধহরি সেন জমিদার, করিধা; শ্রীযুক্ত ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরন্দরপুর।

"বীরভূমি"র নিয়মাবলী।

১। "বীরভূমি" বীরভূম সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র।

২। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।০ চারি আনা। পরিষদের সভ্যগণ ইহা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

৩। প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে "বীরভূমি" নিয়মিতভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহা মাসিক এক সহস্র করিয়া মুদ্রিত হয়।

৪। অশ্লীল ও অসত্যমূলক বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না।

৫। প্রবন্ধাদি পত্রিকা সম্পাদকের নামে ও টাকা কড়ি বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

৬। অমনোনীত প্রবন্ধ টিকিট না পাঠাইলে ফেরত দেওয়া হয় না। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা প্রবন্ধ গৃহীত হয় না।

শ্রীশিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি, এল।

প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ, সিউড়ি, বীরভূম।

দেবালয়।

(দেবালয়-সমিতির নিজস্ব একখানি চৌতল বাটী আছে।)

উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মানুশীলন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশহিতৈষণা ও দান-ধর্ম্ম চর্চ্চা করা দেবালয় সমিতির উদ্দেশ্য। এই দেবালয়ে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্ত মাত্রেরই বক্তৃতা করার ও উপদেশাদি প্রদান করিবার অধিকার আছে।

দেবালয়ের উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, তাঁহারা সভ্য হইতে পারেন, বার্ষিক চাঁদা ১।০।

দেবালয় হইতে "দেবালয়" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। দেশের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ ইহার নিয়মিত লেখক। দেবালয় সমিতির সভ্য মাত্রেই বিনা মূল্যে এই পত্রিকাখানি পাইয়া থাকেন।

দেবালয় সভ্যপদ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেবালয় কর্ম্মস্থানে পত্রলিখিবেন। দেবালয় কর্ম্মস্থান—২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

(১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১৮)

(নবপর্য্যায়)

১ম বর্ষ। ভাদ্র, ১৩১৮ সাল। ১০ম সংখ্যা।

নূতন।

যাঁহারা নিন্দা করিতেছেন, সম্ভ্রম ও কৃতজ্ঞতার সহিত হৃদয় তাঁহাদের চরণমূলে অবনত হউক, কারণ তাঁহারা আমাদের পরম মিত্র। যাঁহাদের সহিত আমাদের মতভেদ বা বিরোধ হইতেছে, আমাদের বিকাশের পক্ষে তাঁহারা প্রকৃত সহায়, তাঁহারাও আমাদের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

হে নূতন! তুমি বাধা পাইয়া ভীত হইতেছ কেন? তুমি বলিতেছ তোমার একটু স্থান্ চাই, কিন্তু তোমায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে, বিনা যুদ্ধে এ পৃথিবী কোন কালেই সূচ্যগ্র পরিমিত স্থান কাহাকেও ছাড়িয়া দেয় নাই। যখন এ সংসারে স্থান চাও, তখন তোমাকেও কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে।

তুমি বলিতেছ তোমাকে কেহ চিনিবার চেষ্টা করিতেছে না, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে না, তোমার যাহা বলিবার আছে তাহা কেহ শুনিতেছে না, অধিক কি তোমার কাতর মুখখানির প্রতিও কেহ স্নেহের চক্ষুতে চাহিতেছে না, কেবল সন্দেহ করিতেছে, কেবল নিন্দা করিতেছে, তোমার গতিরোধ করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। হে আগন্তক! সে জন্ত দুঃখিত হইওনা, ইহাই মঙ্গলের পথ, ইহাই জীবনের পথ। সংসারে এত দিক হইতে এতকথা উঠিতেছে,

এত লোকে নিজ নিজ বক্তব্য লইয়া সমবেত হইয়াছে যে মানুষের সময় নাই। কয়জন মানুষ পরের কথা শুনিতে, পরের বিষয় ভাবিতে পারে? সে যে "সহস্রেষু কশ্চিৎ" হাজারে দু এক জন বৈত নয়! আবার এই যে দু এক জন, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই মুখ্য-রূপে নিজের জন্যই ভাবে, পরের জন্য তাহাদের যে ভাবা বা পরের কথা শোনা সে কেবল নিজের পুষ্টির একটা উপায় মাত্র। যাহারা পুরাতন, অনেকদিন যাহাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করিতেছে তাহা-দের লইয়াই লোকে বিব্রত। নূতনের যথার্থ পরিচয় গ্রহণ যাঁহারা না করেন তাঁহাদের দোষ নাই· তাঁহাদের অনেকেরই সময়াভাব। সুতরাং হে নূতন! হে আগন্তুক, অবসন্ন হইও না, নিরাশ হইওনা।

তুমি কি প্রশ্রয় পাইবার প্রয়াসী? হায় হতভাগ্য শিশু! প্রশ্রয়ের পিচ্ছিল ও শীতল পথে পদার্পণ করিয়া কত জন বিনাশের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে তাহা কি তুমি জান না? কোন কোন দেশে বিজয় বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে মৃত দেহ সমাধি স্থানে লইয়া যায় তাহা কি তুমি শোন নাই?

অদৃষ্টের নির্দ্দয় কশাঘাত প্রভাতে যাহাকে লাঞ্ছনা দিয়াছে, প্রখর সূর্য্য কিরণে সন্তপ্ত কঙ্কর-বালুকাময় প্রচণ্ড পথ অতিবাহন করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলে-বরে যে তৃষিত পথিক সমস্ত মধ্যাহ্ন পর্য্যটন করিয়াছে, অপরাহ্ণ তাহার জন্য কি সুন্দর গৌরবের আসন বিছাইয়া রাখিয়াছে, কি মনোহর পৌর্ণমাসী তাহার জন্য নিরালায় বেশবিন্যাস করিতেছে—তাহা কি তুমি জান না?

মধুমাসের পথিক প্রভাতে ললিত রাগের স্তুতি গীতি শুনিয়া, ছায়াময় ও ফুলময় সুরভিত বনপথে দিনমান যাপন করিয়া, দিবাবসানে অমাবস্যার অন্ধকার মধ্যে কণ্টকারণ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সে কথাটা স্মরণ করিও।

প্রশ্রয় চাহিওনা, নির্ম্মম কশাঘাতের জন্য প্রস্তুত হও। বিরুদ্ধবাদীর পুরোদেশে সম্ভ্রমের সহিত দাঁড়াইতে অভ্যাস কর, দেখিবে প্রত্যেক বিরোধ ও বৈষম্য একটি একটি সোপান, এই সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়াই জগৎ তাঁহাকে খুঁজিতেছে, যিনি "একো বহুনাং"।

কে জানে কোথায় সেই গভীরতম সমন্বয়? কে তাহা যথার্থ ভাবে অনু-ভব করিয়াছে? মানবপ্রকৃতিতে তাহার একটা অস্পষ্ট আভাস আছে বলি য়াই মানব বিরোধের মধ্যে থাকিতে পারেনা, বৈচিত্র্যের মধ্যে সাম্য আবিষ্কা রের জন্য ছট্ ফট্ করে। প্রত্যেক যুগে নূতন নূতন সমস্যার মধ্যে বিব্রত হইয় নূতন রকমের সমন্বয়ের জন্য মানবজাতি চেষ্টা করিতেছে, পুরাতন সমন্বয়ের

মধ্যে মানবের তুষ্টি হয় না, নূতন নূতন সমন্বয়ের মধ্য দিয়া মানবজাতি সেই গভীরতম সমন্বয়কে অন্বেষণ করিতেছে। পূর্ণাঙ্গ ও নিশ্চেষ্ট সমন্বয় মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র এ কথা যাহারা বোঝে না, তাহারাই নূতনের আবির্ভাবে কেবল সংঘর্ষ ও বৈষম্য দেখে—কিন্তু চিরবর্দ্ধনশীল ও অশেষতত্ত্বময় বিশ্বে বিরোধ ও বৈষম্যের মধ্য দিয়াই সমতা ও শান্তি আপনার আসন অন্বেষণ করিতেছে। এ যুগের সমন্বয় পরবর্ত্তী যুগের নূতন তত্ত্ব কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইতেছে;—নিত্যই নব দ্বন্দ্ব, নিত্যই নব সমন্বয়, ইহারই মধ্য দিয়া বিশ্ব চলিয়াছে, বিশ্বমানব চলিয়াছে—

"To that far off Divine event"

সেই সুমহান্ তীর্থধামে।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥"

নূতন! তুমি নিরর্থক নও, তোমার একটা প্রয়োজন আছে, তুমি বিরোধের সৃষ্টি করিতেছ তুমি পুরাতনের মিলকরা সুরগুলির সহিত হয়ত নিজেকে মিল করিতে পারিতেছ না, কেহ বলিতেছে তুমি বেসুরে বাজিতেছ, কেহ বা অন্ধ দাম্ভিকতার পেচক গাম্ভীর্য্যে আপনাকে উপহাসাস্পদ করিয়া বলিতেছে তুমি নিয়ম-বিরুদ্ধ—হে নূতন! তুমি বিচলিত হইও না। একটা গভীরতর সমন্বয়ের রাগিনী আবিষ্কৃত হইবে, মানব সভ্যতার সনাতন অভিব্যক্তি-বিধি তোমাকে উপেক্ষা করিবে না—এক দিন সেই গভীরতর সমন্বয়ের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া তুমি সকলের সহিত মিলিয়া যাইবে, সে দিন তুমি নূতন থাকিবে না সে দিন তুমি পুরাতন হইবে। সে দিন আজিকার কথা মনে রাখিও, সে দিন আবার যে সমস্ত নূতন আগন্তুক স্থানাভিলাষী হইয়া আসিবে তাহাদিগকে চিনিবার চেষ্টা করিও, বুঝিবার চেষ্টা করিও। সে দিনের নূতন আগন্তুক, যদি তোমার এই অনুযোগের পুনরুক্তি করিতে বাধ্য না হয় তাহা হইলেই তোমার জীবন সার্থক।

জগতে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে, এখন যাহা কিছু হইতেছে ও ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে, সে সমস্তের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ যোগ, যে নিগূঢ় একত্ব রহিয়াছে, হে নূতন তোমার উদ্ভবের দ্বারা তাহা স্ফুটতর আকার ধারণ করিতেছে—তুমি অনর্থক নও—তোমার সত্বার এই শ্রেষ্ঠ মহিমা স্মরণ করিয়া বিপদে ও বিষাদে সান্ত্বনালাভ করিও।

তবে চলুক এ ভীষণ দ্বন্দ, নূতনে ও পুরাতনে। আসুক নব নব বৈষম্য ও বৈচিত্র্য। বিশ্বমানব এই বৈচিত্র্যের মধ্যে কাতর হইয়া বেদনার আঘাতে পলে পলে অনুভব করুক সে জীবিত, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করুক তাহার জীবনের মূলে যাহা আছে তাহা সাম্য—আসুক বিরোধ, আসুক বৈষম্য, অসংখ্য নূতন আসিয়া আমাদের এই পুরাতন দেশের সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলুক—আর এই জটিলতার মধ্যে হে গভীরতম সমন্বয়! তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও।

"একোবশী সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখাং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ।

প্রাণী জীবনে আমরা সর্ব্বস্থলেই ক্রম-বিকাশ দেখিতে পাই। একদিনে একটা প্রাণী হঠাৎ বড় হইয়া যায় না একদিনে একজন মানবের হঠাৎ বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হয় না। জগতে ক্রম-বিকাশ দেখা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত এবং সময়ে সময়ে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকি এই জন্য আমরা সহসা কোন লোককে বিপুল অর্থরাশি বা প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হইতে দেখিলে তাহাকে 'ভুঁইফোড়' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া থাকি, পৃথিবীতে নূতন একটা কিছু দেখিলেই বিদ্রোহী ভাব আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে বিচার শক্তি ও সৌন্দর্য্য গ্রহণের ক্ষমতাকে তাড়াইয়া দেয়। নূতনের মৌলিকতা যে পরিমাণে অধিক, প্রথমটা তাহার শত্রুর সংখ্যাও সেই পরিমাণে অধিক হয়। মোটা মুটি হিসাবে আমরা নূতনের শত্রুর সংখ্যা দেখিয়া তাহার সারবত্তার পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারি।

যখন কোন নূতন লোক প্রথমে আমাদের গ্রাম মধ্যে বাস স্থাপনের চেষ্টা করে, তখন আমরা গ্রামশুদ্ধ লোক তাহার প্রতি সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকি, কিন্তু যদি নবাগত ব্যক্তি স্বভাবগুণে আমাদিগকে মোহিত করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কতক লোক তাঁহার পক্ষপাতী হয় বটে কিন্তু

তখনও গ্রামের পুরাতন স্বামী অবশিষ্ট লোককে লইয়া দল বাঁধিয়া দলাদলির সৃষ্টি করেন এবং পুরাতন ও নূতন দলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতে থাকে। কখনও বা এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ আবহমান কাল ধরিয়া চলিতে থাকে এবং কখনও বা প্রবলতর পক্ষ জয়লাভ করিয়া অপর পক্ষকে গ্রাস করে। এইরূপ নূতন ধর্ম্ম, নূতন মত, নূতন বিশ্বাস, নূতন ভাব বা নূতন কোন কিছু যখন আমাদের চিরাভ্যস্ত প্রথাগুলির মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতে যায় তখন আমাদের পুরাতন ভাব গুলি বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করে। গ্রামে নূতন ও পুরাতন দলের দলাদলির ন্যায় ভাব-জগতেও প্রাচীন ও নূতনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে এবং কখনও বা প্রবলতর পুরাতন নূতনকে গ্রাস করিতেছে এবং কখনও বা নূতন প্রবলতর হইয়া পুরাতনকে গ্রাস করিতেছে। নূতনের স্বাভাবিক শক্তি না থাকিলে তাহাকে রণক্ষেত্রে দেখা দিয়াই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হয়, কিন্তু নূতনের যথেষ্ট শক্তি থাকিলে সংগ্রাম অনিবার্য্য। কিন্তু নূতন ও পুরাতনের উদ্দেশ্য কতকটা একরকমের হইলে সময়ে সময়ে পুরাতনের সৈনিকগণের কতক সংখ্যা একে একে যাইয়া নূতনের পক্ষাবলম্বী হয় এবং তখন পুরাতন ভীত হইয়া সন্ধিস্থাপন উদ্দেশ্যে নূতনকে আপনারই জনৈক সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া রণস্থল ত্যাগ করে। কিন্তু পুরাতন যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করিলে কি হইবে, নূতন অনেক সময় এই সেনাপতিত্ব স্বীকার না করিয়া পুরাতনকে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করে। অনেক সময়ে পুরাতনে ও নূতনে সন্ধি হইয়া নূতন তাহার সেনাপতিত্ব স্বীকার করিলেও, পুরাতনের অধীন সেনাপতিগণ সে সন্ধি স্বীকার না করিয়া নূতনের সহিত খণ্ড যুদ্ধ করিতে থাকে। যখন হিন্দুধর্ম্ম বুদ্ধদেবকে অবতার স্বীকার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে স্বইচ্ছায় আপনার অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিল এবং রণস্থল হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম আপনাকে হিন্দুধর্ম্মের অংশ বিশেষ বলিয়া স্বীকারে সন্ধিস্থাপন না করিয়া সগর্ব্বে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল এবং যথাসাধ্য হিন্দুধর্ম্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই কারণ হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছে, সম্প্রদায় বিশেষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, সুতরাং ইহা হিন্দুধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে পরিগণিত হইল, সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের জয়লাভে সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম আপনাকে কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিল না, বরং বৌদ্ধধর্ম্ম অহিন্দুধর্ম্ম হইতে যে শিষ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল তাহাতে সমগ্র হিন্দুধর্ম্মেরই প্রসার ও পরিপুষ্টি লাভ হইতে

লাগিল। চৈতন্ত যুগেও হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ বেগতিক দেখিয়া আপনার মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মকে স্থান ছাড়িয়া দিল কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় সন্ধি অস্বীকার করিল না। বৈষ্ণবধর্ম্ম কার্য্যতঃ আপনাকে হিন্দুধর্ম্মের অংশ বিশেষ বলিয়া স্বীকার করিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সন্ধি স্থাপন সময়ে তাহার অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদলগণের মত গ্রহণ করে নাই সুতরাং এক্ষেত্রেও হিন্দুধর্ম্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত খণ্ডযুদ্ধ করিতে লাগিল। এ সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই।

জগতে আবহমান কাল এই পুরাতনে ও নূতনে ঘোরতর জীবন সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে এই সংগ্রামে নূতনেরই ক্রমশঃ জয়লাভ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নূতনের একটা দোষ আছে নূতন আপনার যোগ্যতার পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই পুরাতনের দোষগুণ একবারেই বিচার না করিয়া পুরাতনের যাহা কিছু আছে সমস্তই সমূলে বিনাশ করিতে চায়। কোন পুরাতন নূতনের যোগ্যতা স্বীকার করিয়া আপনা হইতেই পরাভব স্বীকার করে, কোন পুরাতন বা সংগ্রামে যোগ্যতার প্রমাণ চায়, ফলে সংগ্রামে যে যোগ্য সে থাকিয়া যায় এবং যে অযোগ্য সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই যোগ্যতা ও অযোগ্যতার সংগ্রাম মানব সমাজের মহোপকারী। ইংলণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাহা পুরাতন ও নূতনের যোগ্যতা নির্ণয়ের সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছুই নাই। বর্ত্তমানেও সেখানে দেখা যাইবে নূতনের প্রতিনিধি উদারনৈতিক দল ক্রমাগত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন, "পুরাতন তুমি এ স্থান হইতে দূর হও, আমি তোমাপেক্ষা যোগ্যতর নূতন আসিয়াছি।" কিন্তু পুরাতন সে কথায় কর্ণপাত করিতেছে না এবং বিনা যুদ্ধে তিলার্দ্ধ স্থান ত্যাগ করিতেছে না, উত্তরে প্রতিনিধি রক্ষণশীলদল বলিতেছেন, "তুমি এরূপ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতেছ, তুমি কে? তোমাকে আমরা চিনি না, জানি না, সুতরাং বিশ্বাসও করি না। তুমি যদি যোগ্যতর তবে তাহার পরীক্ষা দাও।" ইংলণ্ডে এই যোগ্যতা ও অযোগ্যতার জীবন সংগ্রামের ফল যোগ্যতার স্থিতি ও অযোগ্যতার বিনাশ।

পুরাতনের উপর নূতনের সম্যক জয়লাভ প্রায় ঘটে না; নূতন প্রায়ই পুরাতনের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। উভয়কেই প্রায়ই কতকটা স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। এই রূপে চিরকাল ধরিয়া পুরাতনের মধ্যে নূতন স্থান গ্রহণ করিয়া পুরাতনকে রূপান্তরিত

করিয়া আসিতেছে এবং পুরাতন নূতনের সহিত সন্ধি স্থাপনে অধিক সবল হইয়া দ্বিতীয় নূতন দেখিয়া উভয়েই তাহার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। নূতন ক্রমাগত আমাদের বার্ষিক নূতন পঞ্জিকার ন্যায় নূতন হইয়া আসিতেছে কিন্তু অচিরেই পুরাতনে মিশিয়া যাইতেছে।

সংসারের প্রত্যেক ব্যাপারে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে সাহিত্য জগতে তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? বঙ্কিম বাবু প্রথমে যখন বাঙ্গলা গদ্যে নূতনত্ব আনিলেন তখন চারি দিকে মহা কলরব উঠিল কিন্তু অচিরে সন্ধি স্থাপিত হইয়া তাহার শান্তি হইল। মাইকেল যখন বঙ্গ-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ আনয়ন করিলেন তখনও চারিদিকে চীৎকার উঠিল কিন্তু তাহাও ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া শেষে ডুবিয়া গেল। রবিবাবু কাব্য জগতে একটি বড় রকমের নূতনত্ব আনিয়াছেন এই জন্য আমরা তাঁহাকে এখনও গ্রহণ করিতে পারি নাই। বাঙ্গলা কাব্যে ক্রমবিকাশ হইতেছিল, সহসা রবীন্দ্রনাথ আসিয়া যেন মন্ত্রবলে দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবকে পরিণত করিলেন। আমরা বালকের কৈশোর অবস্থা দেখিলাম না, সহসা তাহাকে যুবক হইতে দেখিয়া 'ভুঁইফোড়' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। আমরা মনে করি কৈশোর গত না হইলে যৌবন আসে না সুতরাং আমরা তাহার যৌবন প্রাপ্তি স্বীকার না করিয়া তাহাকে অকাল-পক্ক জ্ঞান করিয়া বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হইতেছি। আমাদের পুরাতন-প্রিয় হৃদয় দেখিতে পায় না যে রবীন্দ্রনাথ ক্রমবিকাশের নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই, তাঁহার প্রতিভা এই ক্রমবিকাশের গতি কিছু দ্রুততর করিয়া দিয়াছে এই মাত্র। আমরা এই প্রকার ক্ষিপ্রতায় অনভ্যস্ত বলিয়া তাঁহার কাব্যের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। এমন কি অনেকে পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ তাহার আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টাও করিতেছেন না।

সর্ব্বদেশেই সময়ে সময়ে এরূপ দুই একটি প্রতিভাবান পুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সাধারণ লোকে যে সংস্কার পোষণ করে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানের অনেক অগ্রে ধাবিত হন। বর্ত্তমান বিদ্রোহী হইয়া মুখে "অত অগ্রে যাইও না" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে এবং তাহার অতিবেগ রোধ করিবার নিমিত্ত তাহার প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে, কিন্তু তথাপি স্বয়ং বার বার পদস্খলিত হইয়াও পড়িতে পড়িতে তাহার অনুসরণের চেষ্টা করে। বর্ত্তমানের স্বাভাবিক গতি ধীর এবং নিশ্চিন্ত কিন্তু এইরূপ প্রতিভাবান পুরুষের সংস্পর্শে তাহাকে বড় বিপদগ্রস্ত হইতে

হয়। প্রতিভাবান পুরুষ তাহার নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া যান, ফলে বর্ত্তমান কখনও বা অস্বাভাবিক উদ্যমের ফলে খঞ্জ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় কখনও বা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দূর অগ্রসর হয় ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি লাভ করে।

আজকাল রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা চলিতেছে। যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে কিছু কিছু উপকরণ ও প্রাপ্ত হইতেছেন। খুব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবিকাশে যে সমস্ত শক্তি সহায়তা করিয়াছে, সে সমস্ত শক্তির কোনই উল্লেখ নাই। বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব এই যে, সমস্ত জগত এখন একত্রে মিলিত হইয়াছে, এক মাত্র ইংরাজী সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা সমগ্র বিশ্ব-মানবের চিন্তার পরিচয় লাভ করিতেছি। সম-সাময়িক বিশ্বমানবের সাধনার সহিত রবীন্দ্র নাথের সম্বন্ধ নিরূপণ করা একান্ত প্রয়োজন। কোন্ কবি কোন্ দার্শনিক কোন্ সময়ে তাঁহার জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, কাহার নিকট তিনি কতখানি ঋণী, তাহার হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে রবীন্দ্র-নাথ এই যুগেরই একটি স্বাভাবিক ফল, তাহা না করিলে আমাদের এই জাতি বঞ্চিত হইবে, কারণ বিশ্ব-সভ্যতার যে রস আকর্ষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বড় হইয়াছেন সে রস আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হইবে না। যাঁহারা রবীন্দ্র-নাথের অন্তরঙ্গ শিষ্য, যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন তাঁহারা যে পথে চলিয়াছেন, তাহা ঠিক পথ নহে,—যে সমস্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে বিকশিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সংবাদ গ্রহণ করুন।

রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ কবি যাঁহার রচনা কাব্যজগতে বিপ্লব আনয়ন করে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সহিত তাঁহার প্রভেদ বিস্তর। তিনি কবিতা সুন্দরীকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ ভাব ও সৌন্দর্য্যের চিত্রকর, রবি বাবু ভাব ও সৌন্দর্য্যের Analyst বা বিশ্লেষক। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ ভাব ও সৌন্দর্য্য হইতে সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া তাহা চিত্রিত করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ভাব ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে একান্তভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহা বিশ্লেষণ করিতেছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ ভাব বা সৌন্দর্য্য রূপ শতদল, তীরে দাঁড়াইয়া উজ্জলরূপে

চিত্রিত করিলেন—তাঁহারা আপনাকে এই শতদল হইতে একটি পৃথক সত্ত্বা বলিয়া অনুভব করিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শতদলের মধ্যে আপন সত্ত্বারই একটা বিকাশ বা প্রসার মাত্র অনুভব করিলেন, তাই তিনি তাহার প্রত্যেক পাপড়ি কেশর ও পরাগ আদি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক অনু পরমাণুতে বিভক্ত করিয়া লোক চক্ষুর অগোচর সৌন্দর্য্য অনায়াসে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

ভাব ও সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কবিতা সুন্দরীরও রবীন্দ্রনাথের প্রতি বড় অনুগ্রহ, এ দেশীয় বা অন্য দেশীয় পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ Muse বা কবিতা সুন্দরীর নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হন নাই, দূর হইতে সসম্ভ্রমে প্রণত হইয়া করুণা ভিক্ষা পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। কবিতা সুন্দরী দেবী, তাঁহারা পূজক, এই নিমিত্ত দেবীর প্রতি তাঁহাদের হৃদয় ভক্তিভাবে পূর্ণ, তথায় ভক্তি ভিন্ন অন্য ভাবের প্রবেশাধিকার নাই। কবিতা-সুন্দরী তাঁহাদের আরাধ্যা দেবতা, কিন্তু কবিতা-সুন্দরী রবীন্দ্রনাথের জীবন-সঙ্গিনী প্রণয়িনী। কবিতা সুন্দরী বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের "খেলার সঙ্গিনী" এবং যৌবনে "মর্ম্মের গৃহিনী"। প্রৌঢ়াবস্থাতে রবীন্দ্রনাথের মনে পড়িয়াছে—

"কবে কোন্ ফুল্ল যুথী বনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধ চেনা শোনা'

"এই পৃথিবীর প্রতিবেশিনীর মেয়ে" কবিতা সুন্দরী বালিকা বিশেষ।

"ধরার অস্থির এক বালকের সাথে"

যে কি খেলা খেলাইত তাহা বালক রবীন্দ্রনাথ সম্যক বুঝিতে পারিতেন না।

এই রূপ দেখা শুনা হইতে হইতে এই দুইটি বালক বালিকার মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইল এবং তখন হইতেই ঘনিষ্ঠ ব্যবহার চলিতে লাগিল কিন্তু আগ্রহের মাত্রাটা বালকের অপেক্ষা বালিকারই বেশী বলিয়া বোধ হয়। বালককে একদিনও বালিকার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় নাই।

"তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা-মূর্ত্তি, শুভ্র বস্ত্র পরি'
উষার কিরণ-ধারে সদ্য স্নান করি
বিকচ কুসুম সম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রা ভঙ্গে"

আপনি আসিয়া দেখা দিত, এবং :—

"উপবনে কুড়াতে শেফালী" টানিয়া লইয়া যাইত। বালিকা আমাদের বালক কবিকে

"বারে বারে
শৈশব কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে * * *
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি
দেখায়ে গোপন পথ দিত মুক্ত করি,
পাঠশালা কারা হতে, কোথা গৃহ কোণে
নিয়ে যেত নির্জ্জনেতে রহস্য ভবনে,
জন শূন্য গৃহ ছাদে আকাশের তলে
কি করিত খেলা, কি বিচিত্র কথা বলে'

বালককে ভুলাইত তাহা তাঁহাকে "স্বপ্নসম চমৎকার অর্থহীন" বলিয়া বোধ হইত।

এই রূপ লুকোচুরীর 'কোর্টশিপ' চলিতে চলিতে বাল্যকালেই

"দোঁহে দোঁহা ভালকরে চিনিবার আগে,"

উভয়ের হৃদয় উভয়ের প্রতি "নিশ্চিত বিশ্বাস ভরে" পূর্ণ হইয়া উঠিল।

"তার পরে একদিন কি জানি যে কবে"

তাহা কবি স্বয়ংই বলিতে পারেন না,

"জীবনের বনে, যৌবন-বসন্তে যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে নব নব আশ,
সহসা চকিত হয়ে আপন সঙ্গীতে"

যুবক কবি (আর তিনি বালক নহেন) চমকিয়া দেখিলেন

"খেলাক্ষেত্র হতে
কখন অন্তর লক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসিয়াছে মহিষীর মত !"

তাঁহাকে কেহ "পুরদ্বারে" "হুলুধ্বনি" দিয়া 'বরণ করিয়া" আনে নাই। তিনি আপনি

"লজ্জা মুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে
বধূ হয়ে"

"চিরদিন তরে আপন "অন্তর গৃহে" প্রবেশ করিলেন। বাল্যের "খেলার সঙ্গিনী" এক্ষণে "মর্ম্মের গৃহিনী" হইলেন তাঁহার আর

"সেই
অমূলক হাসি অশ্রু সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা।"

এখন তাঁহার

"স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর,
স্বচ্ছনীলাম্বর সম, হাসি খানি স্থির
অশ্রু শিশিরেতে ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মত, প্রীতি স্নেহ
গভীর সঙ্গীত তানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণ বীণা তন্ত্রী হতে রণিয়া রণিয়া
অনন্ত বেদনা বহি।"

কবিতা সুন্দরীর সহিত রবীন্দ্রনাথের বাল্য ক্রীড়ার ফল চাঞ্চল্য ও যৌবনে মিলনের ফল গম্ভীরতা আমরাও বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। "আদি জননী সিন্ধু"র ন্যায় তাঁহার যৌবনের "কল-কথা" আমাদের হৃদয় তন্ত্রীতেও

"প্রীতি স্নেহ
গভীর সঙ্গীত তানে"

ধ্বনিত করিতেছে।

প্রৌঢ়াবস্থাতেও কবি প্রণয়িনী কবিতাসুন্দরীর প্রতি কিরূপ মুগ্ধ এবং কতটা ঘনিষ্ঠতা আশা করিতেছেন তাহা তাঁহার একদিনের প্রেমভিক্ষাতেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয়। সেদিন তিনি হৃদয়ের প্রবল আগ্রহে প্রণয়িনী রূপিনী দেবী বীণাপানিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন।

"বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস সুন্দর,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও, মৃণাল পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্ম্মান্তে হরষে,
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছল ছল,
মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল

অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উচ্ছাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয় বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।
অর্দ্ধেক অঞ্চল পাতি বসাও যতনে
পার্শ্বে তব, সুমধুর প্রিয় সম্বোধনে
ডাক মোরে, বল, প্রিয়, বল প্রিয়তম
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি মম
হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সঙ্গোপনে বলে যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে ভরা ভাষা অয়ি প্রিয়।
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবা খানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধর পুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে,
সরস সুন্দর; নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো; আনন্দ আভায়
বড় বড় দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে
নিতান্ত নির্ভরে।”

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে যে দেবীর অনুগ্রহ কণা লাভ করিবার নিমিত্ত স্তব গান করিতে হইয়াছে তিনি রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে বসিয়া প্রণয়িণী রূপে আলিঙ্গন দানে উদ্যতা; ইহার কারণ কি? রবীন্দ্রনাথ কবিতা সুন্দরীকে আপনার বলিয়া চিনিয়াছেন, কবিতা সুন্দরীও নিবিড়তম সম্বন্ধের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের আপনার হইয়াছেন।

আর এক কথা, কবিতা সুন্দরীর সান্নিধ্য লাভ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন— তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন, সকলে এ তৃপ্তি উপভোগ করিতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের কার্য্য চিত্রণ তাঁহার কার্য্য বিশ্লেষণ। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ দূর হইতে দাঁড়াইয়া শতদল চিত্রিত করিলেন, সাধারণেও দূরে হইতে শতদল দেখিয়া থাকে, সুতরাং ঐ চিত্র সহজেই তাহা-

দের হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহারা সাধারণতঃ বিশ্লেষণ করে না, সুতরাং বিশ্লেষণ তাহারা সম্যক্ বুঝিতেও পারে না এবং সমগ্র সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ন্যায় শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিবার জন্য দশের মাঝে সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান নহেন, তিনি নির্জ্জনে বসিয়া আত্ম-কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত মানব জীবনের জটিল গুপ্ত তত্ত্ব নিরূপণে যত্ন-পরায়ণ। এই জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সরল কবিতা হাসি মুখে আমাদের নিকটে আসিয়া সাদরে আহ্বান করে—

"এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস
তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখি"

এবং রবীন্দ্রনাথের দুর্ব্বোধ কবিতা মুখখানি গম্ভীর করিয়া দূর হইতে ইঙ্গিতে বলিতে থাকে

"তুমি মোরে পারনা বুঝিতে!
প্রশান্ত বিষাদ ভরে দুটী আঁখি প্রশ্ন করে'
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নত মুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।"

কিন্তু আমরা যে সম্যক বুঝিতে পারি না তাহার কারণ কবিতার অসম্পূর্ণতা নহে, আমাদের সম্পূর্ণ সহৃদয়তার অভাব। রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়তে কবিতা বলিতেছে

"কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে, সব আছে তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা
তাই মোরে বুঝিতে পার না।
*　*　*　*　*
এযে সখি সমস্ত হৃদয়!
কোথা জল, কোথা কূল, দিক হয়ে যায় ভূল,
অন্তহীন রহস্য নিলয়।"
*　*　*　*　*
"বুঝা যায় আধ প্রেম আধ খানা মন
সমস্তকে বুঝেছ কখন।"

কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথকে সম্যক বুঝিতে না পারিলেও এতদিনে রবীন্দ্রনাথের বা নূতনের যে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধুনা বৃদ্ধ প্রতাপ রায়ের ন্যায় শ্রোতা ও বরজলালের ন্যায় গায়কের সংখ্যা আর অধিক নাই। এখন আর বড় আগমনী ও বিজয়ার "গান"এ কাহারও "হৃদয় উচ্ছসিয়া অশ্রুজলে" দুনয়ান ভাসিয়া যায় না। "গোকুলের গোয়াল গাথা ভূপালী মূলতানী সুরে" ও সাহানা আর মর্ম্মে গিয়া বড় বাজে না, অধুনা "যেন পাখী লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা গানই শিক্ষিত সমাজে অধিকতর আদরণীয়। এখন বরজলালের ন্যায় কেহ পুরাতন সুরে গান গাহিতে উঠিলেও সহানুভূতির অভাবে তাহার "গানের সুতার তার" ছিঁড়িয়া যায় এবং "সহসা হা হা রবে তাহাকে কাঁদিয়া উঠিতে হয়, এবং তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ প্রতাপের ন্যায় পুরাতন-প্রিয়ের চক্ষুও সমদুঃখে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে।

আমরা আশা করি পুরাতনপ্রিয়গণ বরজলালের ন্যায় পুরাতনের গান ভঙ্গ হইতে দেখিয়া নূতনেই যথা সম্ভব প্রীতিলাভে চেষ্টিত হইবেন। আমরা তাঁহাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত দেখিতে চাহিনা, কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় না বলিয়া থাকিতে পারি না :—

"হেথা হতে যাও, পুরাতন।
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি
বসন্তের বাতাস বয়েছে।

* * * * *

ঢাক তবে ঢাক মুখ নিয়েযাও সুখ দুখ
চেয়োনা চেয়োনা ফিরে ফিরে।
হেথায় আলয় নাহি ; অনন্তের পানে
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।"

মৌলভী এক্রামদ্দীন।

"তুমিই আমার দেবতা"।

অনেক দিনের অনেক কথা হৃদয় তলে জমিয়া গিয়াছে। আজ বলি, কাল বলি, আর বলা হয় নাই;—কোন দিন হইবে কি না তাহাই বা কে জানে! তুমিও আসিলে না, আমিও ডাকি ডাকি করিয়া থামিয়া গেলাম, আর ডাকা হইল না। সংসারে সকলেই আপন আপন পথে চলিয়াছে—কে কাহার খোঁজ লয়, না ডাকিলে কেউ আসে না, তুমিও আসিলে না। কিন্তু এক-দিন ত ডাকিয়া ছিলাম, তেমন করিয়া জীবনে কাহাকে ডাকিয়াছি! মানুষ তেমন করিয়া জীবনে কয়বার ডাকিতে পারে? আমি অনেক দিন চাহিয়া-ছিলাম,—যখন বা চোখ ফিরাইতাম, তখনো কান পাতিয়া থাকিতাম! হাওয়ার সঙ্গে শুষ্ক গাছের পাতা আমার দুয়ারের সম্মুখ দিয়া মর্ম্মরিয়া যাইত, চমকিয়া উঠিয়া দেখিতাম,—তুমি আসিলে না। বুকের তলে যেন একটা কালো পাথর চাপা পড়িত, জোরে জোরে হাঁফাইয়া উঠিতাম,- তবু ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই খানেই বসিয়া থাকিতাম। কেন, কে জানে? কত কি আসিল, কত কি গেল, কিন্তু সেই তুমি আর আসিলে না।

সংসারে এক দিন যাহা সত্য সত্যই ঘটে, দুই দিন আগে মানুষ কি তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে? আমাদের কল্পনা অপেক্ষা সংসারের বাস্তব ঘটনা সহস্রগুণে অধিক রহস্য ও বিস্ময়ে পূর্ণ। জননী যখন শিশু পুত্রকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে তাহার মুখ চুম্বন করেন, তখন কি তিনি ভাবিতে পারেন যে হয়ত কালই তাঁহার কোলের শিশু শ্মশানের আগুণে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে? সেই মুখে সেই হাসি, আহা জগতে তার কোন চিহ্ন থাকিবে না। কিন্তু এই ঘটনা সংসারে প্রতিদিন ঘটিতেছে। যৌবনের প্রথম স্বপ্ন, জীবনের প্রথম ভালবাসা, ভালবাসার প্রথম আবেগ,—সে কি নেশা, সে কি চাঞ্চল্য সে কি উন্মাদনা! তার মাঝে থাকিয়া মানুষ এমন কত কথা ভুলিয়াও ভাবে না,—ভাবিতে পারে না, যাহা হয় ত ঠিক দুই দিন পরেই তাহার মস্তকে নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বজ্রের মত আসিয়া পতিত হয়। মানুষ শুধু ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে না,—কত সময়ে সে জাগিয়াও স্বপ্ন দেখে। আবার সে সাধের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ভাঙিয়া যায়! হায়, শুধু কি স্বপ্নই ভাঙে? আরো যে অনেক ভাঙে, যা আর এ জীবনে কখনো জোড়া লাগে না!

এই ভাঙা গড়া অহরহ চলিতেছে। শুধু মানুষের জীবনে নয়। চেয়ে

দেখ ঐ প্রকৃতির দিকে, জলে, স্থলে, সুনীল আকাশে। চেয়ে দেখ তোমার জাতির ইতিহাসে,—যুগের পর যুগ কোথায় যাইতেছে, কোথায় লীন হইতেছে? আজ কোথায় তপোবন, কোথায় যজ্ঞধূম, কোথায় মিথিলা কোথায় হস্তিনা, কোথায় রাজগৃহ, কোথায় পাটলী, কোথা সারনাথ, কোথায় নলন্দা কোথা পেশোয়ার, কোথা তমলুক, কোথা উজ্জয়িনী কোথা নবদ্বীপ, কুরুক্ষেত্র কোথা—কোথায় হলদিঘাট—? গিয়াছে, গিয়াছে,—সকলি গিয়াছে সে গরিমা, সে বিভব, কিছুই নাই। তার স্থলে দেখদেখ,—ঐ সে পলাশী, ঐ সে কাটোয়া ঐ সে উধুয়ানালা—! চেয়ে দেখ বিশ্ব মানবের প্রতি, বিশ্বরূপ দেখ; কি বিরাট —কি মহান্, অথচ কি সুনিশ্চিত তার গতি! জীব, জগৎ, ইতিহাস,—ঐ দেখ উঠে পড়ে; ডুবে ভেসে, ভাঙে গড়ে,—তবু দেখ কোথায় ছুটেছে! কোথায় কে জানে? ভাঙে গড়ে, গড়ে ভাঙে, সর্ব্বত্রই এই একই খেলা, একই লীলা।

জীবনে যা ভাঙিতেছে, তা আবার কোথায় গিয়া গড়িয়া উঠিবে? সে কি এই জীবনেই নয়? মাটী বিদীর্ণ করিয়াই না অঙ্কুরের উদ্গম হয়? আমি কি বিদীর্ণ হই নাই? কবে, কোন্ সে অঙ্কুর আমার মাঝে মাথা তুলিবে? যদি কিছু না গড়িয়া উঠে, তবে কেন এত ভাঙিতেছে,—কেন এত ভাঙিতেছে!

* * * ভাঙিবার যাহা তাহা ভাঙিয়া যাক্, ভুলিবার যাহা তাহা ভুলিতে দাও। কিন্তু দেখো, শুধু ভাঙিওনা, শুধু ভুলিও না। এমন কত যে দেখিতেছি যেখানে দীর্ঘ রেখায় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু বিন্দু মাত্র বর্ষে না। শুধু বিদ্যুতের শিখা সহস্র ভুজ প্রসারিত করিয়া সম্মুখে আসে, সে কি আগুণ—সে কি জ্বালা! এমন কত যে দেখিতেছি যেখানে ভুলিয়া যায়, শুধু ভুলিয়াই তারা খেলা সাঙ্গ করে। সেখানে যা কিছু করিয়াছিলাম—সব নিস্ফল,—সব যেন মুছিয়া দিয়াছে। আর ডাকে না, দিন যায় মাস যায়, বর্ষ যায়, আর তারা খোঁজে না। জীবনের উপর ধীরে ধীরে কি যেন এক সমাধি রচিত হইতেছে। বড় নিস্তব্ধ! বড় ভীতি! কি এক কৃষ্ণছায়া, কি অসার—কঠিন—হিম স্পর্শ! কি এই অনুভূতি! এই কি মৃত্যু,—বা এই সেই তুমি?

* * * * ভালবাসি নাই! তোমাকে ভালবাসি নাই? একদিন, একদণ্ডে, সমস্ত জীবন ছেঁচিয়া কি তোমার অধর প্রান্তে তুলিয়া ধরি নাই? বুকের বসন ছিড়িয়া কি আমি হৃদয়ের শেষ বিন্দু টুকু ছাকিয়া দিই নাই? উঃ আর পারি না। যাহা বলিবার নয়, তাহা কি করিয়া বলি। মরুভূমে পথিক দেখিয়াছ? প্রেমের চক্ষে মৃগতৃষ্ণিকা দেখিয়াছ? ছুটিয়া গিয়াছ?

আকুল তৃষায় বিষ পান করিয়াছ? বিষের জ্বালায় দিগ্‌দিকে পাগল হইয়া ফিরিয়াছ? তবে কি? তবে তুমি কিছুই বুঝিতে পারিবে না। তুমি যাও।

হে সুন্দর নবঘন শ্যাম, ঐ সজল জলদ তোমার অঙ্গের আভা,—এস স্নিগ্ধ, এস কান্ত, এস দগ্ধ হৃদয়ে শ্রাবণের বারি ধারা,—একবার জুড়াইয়া যাও। জীবনে কি শুধু মরুভূমি? তবে কেন তরু-পল্লবে রচিত এই সুনিবিড় ঘন ছায়া? কেন ডাকে, কেন বলে—"এসরে তাপিত এসরে মূর্খ ক্ষণিকের তরে জুড়াইয়া যাও"। জীবন কি শুধু মরুভূমি? তবে কেন পাখী ডাকে, অনন্ত আকাশে তার প্রতিধ্বনি ছুটে; কেন জ্যোৎস্নায়ে পৃথিবী ভেসে যায়, কেন মন্দ মলয় গন্ধ বহে আনে? নদী কেন গান গায়, শিশু কেন খেলা করে, তারা কেন মিটি মিটি হাসে? জীবন কি শুধু মরুভূমি? সে আসিল না,—তাই? যদি আসিত, কাছে বসিত, তেমনি করিয়া শুধু একবার চাহিয়া দেখিত, এক-বার—। সে আসিল না তাই।

তাই? না। তবু জীবন শুধু মরুভূমি নয়। কিসের উপর জীবনকে গড়িতে চাও? ঐ দৃষ্টি, ঐ স্পর্শ, ঐ চুম্বন, ঐ মদিরা? তরঙ্গে তরঙ্গে প্রহত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। দেখিবে ঐ ইন্দ্রধনু, দেখিতে দেখিতে কোথায় লুকায়! সে কি ভ্রান্তি, কি মরীচিকা, কি আত্ম প্রতারণা। তুমি যাহা চাও, তাহা পাও না বলিয়াই কি জীবন মরুভূমি? তোমার তৃষ্ণার পানীয় মিলে না বলিয়াই কি তুমি শুষ্কতালু? তুমি কি চাও? তোমার কিসের তৃষ্ণা! অর্থ প্রভুত্ব, জ্ঞান গৌরব, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি? ইহা না পাইয়া মানুষ অনেক সময় কষ্ট পায় বটে, কিন্তু ইহা পাইলেও কি তাহার সকল অভাব, সকল কষ্ট দূর হয়! ইহার বঞ্চনাতেও দুঃখ, ইহার লাভেও তৃপ্তি নাই। যে ভালবাসা পাইলে না বলিয়া আজ জীবন মরুভূমি হইয়া গেল, সে ভালবাসা পাইলেও তুমি যেমন ভাবিতেছ, ঠিক তেমন হইত না জীবন নিকুঞ্জে কেবলি পাখী গাহে না,—কুসুম ফুটে না,—ঐ সবুজ চিক্কণ ঘন পত্র, নিদাঘে শুকাইয়া যায়, ঝড়ে উড়াইয়া নেয়। ইহাই সংসার। তাই শুধু পাইলে না বলিয়া জীবন মরুভূমি নয়।

তুমি কি চাহিয়াছিলে? নিজের স্বার্থ ভুলিয়া দেশের হিত চাহিয়াছিলে? ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া প্রাণ পণ করিয়াছিলে? জগতে দুঃখ দেখিয়া বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলে? মহত্ব খুঁজিতে আঁধার নিশীথে বাহির হইয়াছিলে? বজ্রের অনল মাথায় ধরিয়া পথ চলিয়াছিলে? হায়, হায়, কি অসার জিনিষই চাহিয়া-ছিলে, আর তাই পাও নাই বলিয়া দিগ্বিদিকে হাহাকার রব তুলিয়াছ!

মানুষ হইয়া মনুষ্যত্ব চাহিতে পার নাই, তোমার জীবন মরুভূমি হইবে না ত কি ?

হে সংসারি, তোমায় সন্ন্যাসী সাজিতে বলি না। কিন্তু তুমি মানুষ, মনুষ্যত্ব লাভ কর। যাহাকে প্রেম বলিতেছ, তাহা ত শুধু ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব নয়। মানুষ সব দেখে, কীট হইতে কীটানু দেখে, আবার আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের গতি দেখে, কিন্তু সে নিজের দিকে ভাল করিয়া দেখে না। তাই শুধু পাইলে না বলিয়া জীবন মরুভূমি নয়। কি পাইলে না আগে তাহাই ভাবিয়া দেখ।

শাস্ত্রে বলে, বলহীন তাঁহাকে পায় না। যাহা কিছু দুর্ব্বলতা আনে, তাহাই পাপ। প্রেম যে আবেশে জড়িত তাহা আমি জানি। কিন্তু যদি সে, দিনের পর দিন শিথিল করিয়া দেয়! বিনিদ্র নিশায় কেবলি অসার কল্পনায় ডুবাইয়া রাখে তবে সে প্রেম নয়। কি? সে মোহ। মোহান্ধ জীবের মুক্তি কোথায়? মুক্তি ভিন্ন জীবের সফলতা কি? মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, যে প্রেম বন্ধন, সে প্রেম হইতে মুক্তি চাই, যাহা ত্যাগ যাহা বীর্য্য, যাহা বলদ, যাহা আত্মনিষ্ঠ,, যাহা পূর্ণ যাঁহার লীলায় সংসার, আমি তাঁহার সেবা চাই। হে প্রয়াণ, তুমি কোথায়! তুমি কোথায় আর কত দিন শূন্য প্রেক্ষণে চাহিয়া থাকিব? আমি তোমার সেবা চাই, তোমার সেবাই আমার প্রেম, এই প্রেমেরই আমার মুক্তি। সংসার আমার প্রিয়, কেন না সংসার তোমার লীলা। আজ যে জীবন শ্মশান হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার কোন দুঃখই নাই। ঐ কুণ্ডলি বাঁধিয়া ধোঁয়া উঠিতেছে, জীবন শ্মশানে ঐ শব পচিতেছে,—নৈশস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া ঐ কুক্কুরের 'ঘেউ ঘেউ'—রব শুনা যাইতেছে। কি দুর্গন্ধময় বাষ্প। হে শিব তুমি না শ্মশানেই আসন পাত? হে শূলপাণি, তোমার ব্যাঘ্র চর্ম্ম আমার হৃদয়ের উপর বিছাইয়া দাও, তোমার ত্রিশূল সেখানে বিদ্ধ করিয়া রাখ। তাতে কি; আমার হৃদয়ে অনেক বিঁধিয়াছে। তোমার অনুচর পিশাচের দল, তারাও আমার বুকে নৃত্য করুক। মানুষে পিশাচে আর ভেদ নাই। এস নীলকণ্ঠ, তুমি পরের জন্য বিষপান করিয়াছিলে. তুমিই আমার দেবতা। এস, আসন পাত; হে শিব, তুমি আসন পাত। যাহা গিয়াছে, তাহা যাক্। হে বিশ্বের কল্যাণ, তুমি আমাতে প্রতিষ্ঠিত হও।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

বর্ষা।

বিশ্বরূপী হে শঙ্কর! লক্ষ বাহু প্রসারিয়ে আজ
সন্তাপিতা ধরিত্রীরে বাঁধিবারে গাঢ় আলিঙ্গনে,
তুমি কিবা বর্ষারূপে দেখা দিলে বসুন্ধরা মাঝ
মুগ্ধ প্রাণে আজি তাই ভাবিতেছি শুধু ক্ষণে ক্ষণে!

অজস্র মলিন পাত—ত্রিদিবের মুক্ত সুধা-ধারা—
প্রেমের প্লাবন এযে কিংবা তীব্র মদির চুম্বন!
বিরহিনী ধরাসতী অফুরন্ত হর্ষে আত্ম-হারা
স্খলিত প্রান্তরে বনে পুষ্প-মাল্য শ্যামল বসন!

ডুবে গেছে রবি চন্দ্র—স্তব্ধ মৌন বিশাল জগত—
দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত কি নিবিড় সুখদ মিলন!
আনন্দের বার্ত্তা শুধু বহে বায়ু উন্মত্তের মত,
সৌদামিনী হেসে চায়—চাতকিনী পুলকে মগন!

প্রাণেশ! হৃদয়-সখা! আমি কিগো একাকী কেবল
বহিব আজন্ম ধরি' বিচ্ছেদের তপ্ত আঁখি-জল!

শ্রী জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শেষ গান।

ফুল গুলি সব ফুটে' ফুটে' গেল
কানন গহন তলে,
তারা গুলি ওই সব ফুটে যায়
সাঁঝের গগন-তলে,
প্রভাতের মেলা কোথা ভেঙ্গে যায়,
সকল পথিক পথ পানে চায়,
দিবসের সাথে দিনের ফুরায়
সকলের পাওয়া-চাওয়া,
শেষ হবে কবে শুধু ভাবি মোর
ভিখারীর নাম-গাওয়া।

শেষ হ'য়ে সে যে শেষ হ'য়ে যাবে
সকল শেষের মাঝে!
ঝরিবার মত ফোটেনি 'ত' গান,
এখনো এ ভরা সাঁঝে।
যদি গীতহীন, ধূলিলীন বাঁশি,
টুটে' যাবে মোর পরাণের হাসি,
আঁধার নয়নে আলোকের রাশি
নিবে যাবে চিরতরে—
শেষের গানটি এখনো প্রভু গো,
থাক্ অনেকের পরে।
একদিন যবে বাহুটি অলস,
বীণাটি পড়িবে বুকে,
মরণ-বরণ রুখু কেশপাশ
আবরিবে চোখেমুখে,
অধর আঁকিবে সে কি হাসি-রেখা!
নয়ন-কিনারে সলিলের লেখা
আছে কি না আছে নাহি যাবে দেখা,
গুঞ্জরি' অফুরাণ—
সব-শেষ-গীত সহসা কখন
হ'য়ে যাবে অবসান।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

বাসনা।

১

আহা, যদি প্রিয়তমা হইত আমার,
তা নয়,—
আহা প্রিয়তমা হইত নলিনী
সরসি হইত যদি মোর আঁখি ছুটি
জাগিত ভাস্কর যদি দিবস রজনী
ফুটিয়া রহিত যদি অম্লান নলিনী;

২

আমি যদি হইতাম সরস বকুল
হইত সে প্রিয়তমা প্রফুল্ল মালতী
শরতে হেমন্তে যদি বিকশিত ফুল
ভ্রমর ঝঙ্কার দোহে করিত আকুল;

৩

আমি যদি হইতাম বিশাল আকাশ
প্রেয়সী হইত যদি পূর্ণিমার শশী
নিতিনিতি সমভাবে হইত প্রকাশ
বরষায় হাসিত সে শরতের হাস ;

৪

যদি সে বাসন্তী উষা হইত প্রেয়সী
বনচর বিহঙ্গম হইতাম আমি
ফুটিত নলিনী যবে, পোহাইত নিশি
শুনাতাম মধুরব বৃক্ষ-শাখে বসি

৫

আমি যদি হইতাম বরষার জল
প্রেয়সী আমার যদি হইত চাতকী
মধুমাসে ঢালিতাম বারি সুশীতল
ঝরিতাম প্রেয়সীর সাধে সে কেবল ;

৬

আমি যদি হইতাম জলধি অপার
স্নেহের পুতলী যদি হইত মুকুতা
শুষিতাম নদনদী গর্ভে আপনার
নিরবধি বহিতাম অকুল পাথার ;

৭

আহা যদি সোহাগিনী হইত তটিনী
আমি যদি হইতাম প্রবাহিত বারি
তুষিতাম তৃষাতুর হরিণ হরিণী
ছুটিতাম গেয়ে গেয়ে কুল কুল ধ্বনী ;

৮

আমি যদি হইতাম নিশির শিশির
সে যদি হইত মোর প্রফুল্ল কুসুম
দিবসেও ঝরিতাম ঠেলিয়ে মিহির
হাসিয়ে কুসুমমালা হইত অধীর ;

৯

মধুচক্র হ'ত যদি সে মধুবদন
চঞ্চল মক্ষিকা বিধি গড়িত আমায়
ফুলে ফুলে করিতাম মধু আহরণ
রাখিতাম স্তরে স্তরে করিয়া যতন ;

১০

বাঁসের বাঁশরী যদি হইত সে প্রিয়া
আমি যদি হইতাম অবোধ রাখাল
ফুঁকিতাম দিবানিশি মুখে মুখ দিয়া
নীরবে বিজনে ধ্বনী ধাইত ছুটিয়া:

১১

সে যদি আমার হ'ত—
না,—
আমি কায়া সে যদি হইত মোর প্রাণ
আমি যদি সে হতাম সে হইত আমি,
নীরবে মুদিয়া আঁখি হারাইয়া জ্ঞান
ধরাধামে রাখিতাম প্রণয় নিশান।

৺মহম্মদআজিজ উস্ সোভান।

প্রাচীন-বঙ্গ সাহিত্যে বৃহত্তম গ্রন্থ-রচয়িতা কে ?

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে বৃহত্তম গ্রন্থরচয়িতা কে ?—বঙ্গ-সাহিত্য বিষয়ক এই সঙ্গত ও অভিনব প্রশ্নোত্থাপনের আবশ্যকতা এতদিন অনুভূত হয় নাই—এখন বোধ হয়, এ বিষয়ের আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একের প্রাপ্য গৌরবময় আসন, অপরকে অযথাভাবে প্রদান করা অপরাধের কথা। যতদিন আমরা এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম, যতদিন আমরা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের বিশালতার কথা ধারণা করিবার অবসর প্রাপ্ত হই নাই, ততদিন আমরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ হইতেই কোন গ্রন্থকার বিশেষকে বাছিয়া লইয়া, তাঁহাকেই এই গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছিলাম।

বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্র, অনুরক্ত সাহিত্য-সেবকগণ কর্তৃক যতই কর্ষিত হইতেছে, আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা, ইহা ততই নিত্য-নূতন, লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত বিবিধ রত্ন উপহার প্রদান করিয়া আমাদিগকে যুগপৎ উপকৃত ও গৌরবান্বিত করিতেছেন। আমরা বহু আশা ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্বোধিত হইয়া আজ পূর্ণ সপ্তদশ বর্ষকাল বঙ্গ-সাহিত্যের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছি—এই কয় বৎসর মধ্যেই বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন পুস্তকাদির অনুসন্ধান কার্য্য যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতায় অগ্রসর হইতে লক্ষ্য করিয়াছি,—এই অত্যল্পকাল মধ্যেই যেরূপ সহস্র সহস্র প্রাচীন অপ্রকাশিত বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থাদির অনুসন্ধান ও তৎসমুদয়ের পরিচয়াদি সংগৃহীত হইয়াছে, আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ভারতীয় যে কোন ভাষার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতগুলি প্রাচীন অপ্রকাশিত পুস্তকের পরিচয় সংগৃহীত হওয়া সত্বেও এখন মনে হইতেছে—এবং কার্য্য-ক্ষেত্রেও তদ্রূপ প্রমাণিত হইতেছে যে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অনুসন্ধান কার্য্যের সমাপ্তির কথা ত দূরের কথা—শতাংশের একাংশ হইয়াছে কিনা সন্দেহের কথা।

একা "বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ," আপনাদিগকে প্রতিমাসে ত্রিশ চল্লিশখানি খানি করিয়া নূতন ও অপরিজ্ঞাত প্রাচীন পুঁথির পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন—এতদ্ব্যতীত এখনও পরিষদের হস্তে সহস্রাধিক পুঁথি সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে, যেগুলির পরিচয় ক্রমশঃ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে।

আপনারা অবগত আছেন, বীরভূমে প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ-কার্য্য মাত্র তিন চারিজন নিঃস্বার্থ মহানুভবের ঐকান্তিকী চেষ্টার দ্বারা হইতেছে এবং ইহাঁদেরই চেষ্টার ফলে বীরভূম-পরিষৎ প্রতিমাসে অসংখ্য অপ্রকাশিতনামা প্রাচীন গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিয়া ধন্য হইতেছে। এইরূপে আপনারা যদি সকলেই,—সকলেই কেন—সমগ্র জেলার মধ্যে যদি অন্ততঃ দশ বারজনও এ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অবহিত হন, তাহা হইলে এক বৎসরকাল মধ্যেই বীরভূম পরিষৎ কর্ত্তৃক তিন চারি সহস্র পুঁথি সংগৃহীত হইতে পারে।

যাহা হউক, এই অল্পকাল মধ্যে দুই চারিজনের চেষ্টায় বীরভূম পরিষৎ যাহা করিয়াছেন, এইরূপ যদি সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতি জেলায় প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান চলিতে থাকে, তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইবেন বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে কতই না অতুল সম্পদ প্রোথিত রহিয়াছে—যাহা সামান্য চেষ্টারফলে প্রকাশমান হইয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়া দিবে।

যখন আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রতিনিয়তই বহুসংখ্যক গ্রন্থ সংগৃহীত হইতেছে,–যখন বঙ্গ-সাহিত্যের গ্রন্থ-সংখ্যা মুষ্টীমেয়–এ কলঙ্ক অপণোদিত হইয়াছে—যখন ইহার বিস্তার ও প্রাসর্য্য দ্রুতগতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তখন আমাদের, অন্ততঃ ভাণ্ডার রক্ষকগণের কর্ত্তব্য, এই সকল গ্রন্থের পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া বিভিন্ন ক্রম অনুসারে বিভক্ত করা। এই কার্য্য যে একবারেই হইতেছে না, এ অনুযোগ করা নিতান্তই অন্যায় হইবে—কেন না, এ বিষয় উপযুক্ত কৃতী ব্যক্তিগণ অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে, সর্ব্বাদৌ সমাজের মনে যে প্রশ্ন সমুদিত হয়, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। সেই প্রশ্ন—

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে বৃহত্তম গ্রন্থ-রচয়িতা কে ?

বাহ্য আকারে সর্ব্বাপেক্ষা অতিকায় গ্রন্থ রচয়িতার নির্দ্দেশ, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের বিশষরূপ আবশ্যক না হইতে পারে, কিন্তু এই সংবাদ জানিবার জন্য প্রত্যেক সাহিত্য-সেবী, প্রত্যেক বঙ্গভাষা-ভাষী—ব্যক্তির কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বিশালতার একটা নিজস্ব ও আনুসঙ্গিক গাম্ভীর্য্য আছে, যাহার নিকট—সম্ভ্রম স্বতঃই লুটাইয়া পড়ে। আবার এই অতিকায় গ্রন্থ যদি প্রতিপাদ্য বিষয়ের যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, কাব্যালঙ্কারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার গৌরবলাভ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এইরূপ একখানি জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাত গ্রন্থের প্রসঙ্গ অবতারণা করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

এই গ্রন্থখানি ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই গ্রন্থখানির প্রচার হয় নাই। যে গ্রন্থকে আজ আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের বৃহত্তমগ্রন্থ বলিয়া গৌরবময় আসন প্রদানে উৎসুক হইয়াছি, সেই গ্রন্থখানির নাম পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যে কোনও ইতিহাসে স্থানলাভ করে নাই—ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে!

বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর ও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—যে সময় ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, রাষ্ট্রবিপ্লবের তাণ্ডব অভিনয়ে সমগ্র দেশ আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল—সেই সময়ে বাঁকুড়া জেলার দশঘরা নামক এক নিভৃত পল্লীতে কায়স্থ কুলে স্বর্গীয় রাধামাধব ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

সেই বিষম অশান্তিপূর্ণ সময়ে, যখন বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ বিষয় সম্পত্তি ও আত্মরক্ষার জন্য অতিমাত্রায় বিব্রত, সেই সময়েও স্বর্গীয় রাধামাধব ঘোষ মহাশয় যে বিরাট কল্পনা ধারণা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই যেরূপ অসাধারণ, তদ্রূপ বিস্ময়কর। জীবন-ব্যাপী অবিরাম কবির পরিশ্রম, বিশাল শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন ও তৎসমুদয়ের ধারণা, কল্পনা ও বিকাশ এবং অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির পরিস্ফুরণ—এতৎসমুদয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইতে হয়।

স্বর্গীয় রাধামাধব ঘোষ মহাশয় সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়া তাহার সারাংশ "ভাষা"-কথায় পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে "বৃহৎ সারাবলী বা পুরাণসার-সংগ্রহ" এই নাম দিয়া একখানি পুস্তক রচনা করেন। অদ্য আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এই পুস্তকখানিই প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে কাব্যাপেক্ষা বৃহত্তম গ্রন্থ এবং ইহার ভাগ্যবান রচয়িতা বঙ্গভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম রচয়িতা বলিয়া গৌরবময় আসন প্রাপ্ত হইবার একমাত্র অধিকারী। বলা বাহুল্য ভবিষ্যতে এতদপেক্ষা বৃহত্তর কোন গ্রন্থের সন্ধান প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য সমাদর করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইব না।

"বৃহৎ সারাবলী বা পুরাণ সার সংগ্রহ" নামক মহাকাব্য গ্রন্থখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত—(১) কৃষ্ণলীলা, (২) রামলীলা (৩) জগন্নাথলীলা (৪) চৈতন্যলীলা ও (৫) বুদ্ধলীলা।

"কৃষ্ণলীলা" খণ্ড আবার বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন অংশে বিভক্ত। রয়াল আটপেজী স্মলপাইকা অক্ষরে দুই কলম হিসাবে ৯১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুতরাং এই গ্রন্থে ন্যূনাধিক ৩৩০০ শ্লোক আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে

হইবে। অর্থাৎ স্থূলতঃ এই একমাত্র "কৃষ্ণলীলা" খণ্ডই কাশীরামদাস বিরচিত প্রচলিত মাহাভারতের তুল্য রূপ বৃহৎ। আমরা কাশীরাম দাসের মহাভারতের সহিত তুলনা করিলাম, কেন না, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে এতদপেক্ষা অপর কোন বৃহত্তম গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা জনসাধারণে অবগত ছিল না।

"রামলীলা" গ্রন্থখানি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণের সহিত আকারে প্রায়ই সমান—বরং কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইবারই কথা!

"জগন্নাথলীলা"—১১০০০ শ্লোক, রয়াল আটপেজী দুই কলমে ৩৬১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

অপর দুই খণ্ড আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। তবে অবগত আছি, এই দুই খণ্ডের মধ্যে "বুদ্ধলীলা" "রামলীলা" "জগন্নাথলীলা"র অনুরূপ এবং "চৈতন্যলীলা" এতদপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ বৃহৎ।

ফলতঃ হিসাব করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সমগ্র "বৃহৎ সারাবলী" গ্রন্থখানি ৯৫০০০ অর্থাৎ প্রায়ই লক্ষ শ্লোক দ্বারা বিরচিত! সংস্কৃত সাহিত্যে বেদব্যাস কৃত মহাভারত ব্যতীত আর কোন ভারতীয় গ্রন্থের এরূপ খ্যাতি আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

এই গ্রন্থখানি, গ্রন্থকারের বংশধরগণ কর্ত্তৃক অর্থাভাবে অমুদ্রিত অবস্থায় রক্ষিত ছিল। প্রায় ২০ বৎসর হইল ইহাঁরা বাঁকুড়ার মুদ্রাযন্ত্রের পরিপালককে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে প্রচুর পরিমাণে ঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। বাঁকুড়া প্রেসের সত্তাধিকারী মহাশয় বহু অর্থব্যয় করিয়া মাত্র তিনখণ্ড পুস্তক এই ২০ বৎসর কাল মধ্যে ক্রমশঃ প্রকাশিত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অগত্যাই তিনি অবশিষ্ট দুই খণ্ড "চৈতন্যলীলা" ও "বুদ্ধলীলা" প্রকাশিত করিয়া অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। ইহা আমাদের দুরপণেয় কলঙ্কের কথা।

এই গ্রন্থখানি স্থানীয় প্রেসে মুদ্রিত হইলেও রীতিমত ভাবে প্রচারিত হইতে পারে নাই—নচেৎ এই বৃহত্তমগ্রন্থের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যের কোনও ইতিহাসের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। ইহা যে নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

"বৃহৎ সারাবলী" পুস্তক প্রকাশকের নিকট আমরা অনুসন্ধান করিয়াও এই গ্রন্থ রচয়িতার পরিচয় সম্বন্ধে কোন রূপ সহায়তা লাভ করিতে পারি নাই। গ্রন্থের স্থানে স্থানে গ্রন্থকার স্বয়ং যেরূপ আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া-

ছেন তাহাই এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। "জগন্নাথলীলা" গ্রন্থের এক স্থানে আছে,—

দশঘর গণ্ডগ্রাম তথায় সাফুল্লিরাম
কায়স্থ কুলজ গুণধাম।
মধ্যাংশ কুলের পতি ঘোষজ পদবী খ্যাতি
তস্য সুত রামপ্রসাদ নাম।
রাধামাধব তস্য সুত রচিল নূতন গীত
মনে রাখি গোবিন্দ চরণে।
ভব নদী পারাপারে কর্ণধার জানি এরে
শুদ্ধচিত্তে শুন সাধু জনে॥ (পৃঃ ৪০—৪১)

আবার এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে এই রূপ ভনিতা দৃষ্ট হয়, যথা—

স্কন্দ পুরাণের কথা, মনোহর গীত গাঁথা
শ্রবণে কলুষ বিনাশন।
সাফুল্লী রামের পৌত্র রাম প্রসাদের পুত্র
বিরচিল অলক নন্দন॥ (পৃঃ ২৩৪)

* * * *

জগন্নাথ পাদপদ্ম সদা করি ধ্যান।
সেই ত পাইল তত্ত্ব সে স্কন্দ পুরাণ॥
শ্রীরাধামাধব ভণে সেই তত্ত্ব সার।
রক্ষাকর জগবন্ধু তিনটি কুমার॥ * (পৃঃ ৩৬৯)

* * * *

বৈষ্ণবের পদরেণু করিয়া প্রয়াস।
প্রকাশ করিল গ্রন্থ এ মাধব দাস॥ (কৃষ্ণলীলা ৮৪৪ পৃঃ)

* * * *

বৃহৎ সারাবলী কথা সুধার সাগর।
মাধবে করুণা কর হে করুণা কর॥ (ঐ ৮৮৫ পৃঃ)

"কৃষ্ণলীলা" খণ্ডের এক স্থলে লিখিত আছে,—

সংগ্রহ করিয়া সব পুরাণের সার।
এ রাধামাধব কয় রচিয়া পয়ার॥ (৮১৩ পৃঃ)

* শ্রীপতি, শ্রীনাথ ও শ্রীগোপাল—কৃষ্ণলীলা। পৃঃ ১১৯।

বাস্তবিকই, গ্রন্থকার সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থে, সমবিধায়াবালম্বনে যে সকল আপাত-বৈষম্য বিশিষ্ট প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, তৎ সমুদয়ের সামঞ্জস্য করিয়া এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বিষয় বিভাগ দেখিলেই এই কথার যথার্থ স্পষ্টরূপ বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুশাস্ত্রে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, জগন্নাথলীলা, বুদ্ধলীলা ও চৈতন্যলীলা ব্যতীত অপর প্রসঙ্গ তাদৃশ বিস্তৃত নহে। সুতরাং, গ্রন্থকার এই পঞ্চলীলা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক লীলা বিষয়ক যে পুস্তক আছে, তৎসমুদয় একত্র সংগৃহীত করিয়া তাহার সার অংশ বঙ্গ ভাষায় ছন্দকারে নিবদ্ধ করিয়া এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ সৃজন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে প্রসঙ্গ ক্রমে যাবতীয় প্রধান প্রধান পৌরাণিক উপাখ্যান, দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ক জটিলসমস্যার আলোচনা ও মীমাংসা, অতি সরল ও কবিত্বময় ভাষায় বিবৃত হইয়াছে!

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিপুলকায় গ্রন্থের বিবিধ বিবরণ, কাব্যাংশের পরিচয় ও গুণাগুণের সম্যক্‌রূপ আলোচনা করা অসম্ভব। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এতৎ সম্বন্ধে যথাযথভাবে আলোচনা করা যাইবে বলিয়া আমরা এখন মাত্র দুই এক স্থান হইতে যথেচ্ছভাবে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের প্রতি অবিচার করিতে নিরস্ত হইলাম। *

শ্রীশিবরতন মিত্র।

ভাগবত ধৰ্ম্ম।

২। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত।

মহাভারতের সহিত শ্রীমদ্ভাগত গ্রন্থের যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। প্রথম প্রবন্ধে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রথমেই ইতিহাস রহিয়াছে যে ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করিলেন ও মহাভারত রচনা করিলেন। কেবলমাত্র লোকহিতের জন্য সংযত ভাবে ও প্রাচীন শাস্ত্রাদির মর্ম্ম যথাবিধি অনুসরণ করিয়া তিনি নিজের অমানুষিক প্রতিভা বলে এই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্য করার পর তাঁহার মনে তৃপ্তি হইল না, তাঁহার মনে হইতে

---

* "বীরভূম সাহিত্য পরিষদে"র দ্বিতীয় বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে (২৯শে বৈশাখ ১৩১৮) পঠিত।

লাগিল যে তাঁহার জীবনের ব্রত এখনও উদ্‌যাপিত হয় নাই—জীবের যথার্থ কল্যাণ পথ এখনও তিনি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

এই প্রকার অশান্ত অবস্থায় ব্যাসদেব সরস্বতী নদীর তীরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ দেবদত্ত বীণায় মুচ্ছ্‌না দিয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে ব্যাসদেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ব্যাসদেবের আর আনন্দের সীমা নাই—সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্য অর্ঘদানে ঋষির পূজা করিলেন। ঋষি সুখাসীন হইয়া ব্যাসদেবকে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেব নারদের নিকট তাঁহার চিত্তের অপ্রসন্নতার কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলে পর নারদ বলিলেন যে ভগবানের মহিমা মুখ্যভাবে কীর্ত্তন কর নাই বলিয়া তোমার রচিত গ্রন্থগুলির একটি অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। তাহার পর নারদ তাঁহার পূর্ব্ব কল্পের জীবন বৃত্তান্ত ব্যাসদেবের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। নারদ পূর্ব্বকল্পে দাসী পুত্র ছিলেন। সাধুগণের সেবা করিয়া সৎসঙ্গ ও ভগবানের লীলা শ্রবণ এই দুইটির প্রভাবে তাঁহার চিত্তে কেমন করিয়া শুদ্ধাভক্তি, ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন। তাঁহার একবার অনুরাগ জন্মিলে পর ভগবানের ইচ্ছায় আপনা হইতেই তিনি কেমন করিয়া সংসারের ভার হইতে অব্যাহতি পাইয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনা করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহার এই অনুরাগ হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ভগবান কেমন করিয়া তাঁহার নিখিল-রসামৃতসিন্ধু রূপ তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবের নিকট তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। তাহার পর প্রলয় হইল, প্রলয়ে সমস্ত যখন বিনষ্ট হইল তখন ভগবানের অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নারদ কেমন করিয়া প্রলয় রাত্রি যাপন করিলেন ও প্রলয় রাত্রির অবসানে ভগবানের করুণায় তিনি কেমন করিয়া দেবর্ষিত্ব লাভ করিলেন, নারদ ব্যাসকে তাহা সমস্তই বুঝাইয়া দিলেন ও মুখ্যরূপে ভগবানের গুণানুবাদপূর্ণ এই ভাগবতশাস্ত্র প্রণয়ন করিবার জন্য ব্যাসকে উপদেশ দিলেন। নারদের উপদেশমত ব্যাসদেব এই ভাগবত রচনা করিলেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রথম চিত্র, সে কথা প্রথম প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

"যদা মৃধে কৌরব সৃঞ্জয়ানাং বীরেষ্বথো বীরগতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষ ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেণ ॥" ১।৭।১৩

ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম চিত্র। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ আঠার দিন কাল যে প্রাঙ্গণ মহারথগণের অস্ত্র ঝনৎকারে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল আজ তাহা নীরব। কি বিরাট ব্যাপারই না হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের যাবতীয় অমিত বিক্রমশালী রাজেন্দ্র বৃন্দ নিজ নিজ হস্তী অশ্ব পদাতিকগণকে লইয়া এই স্থলে সমবেত হইয়াছিলেন। আজ সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। রুধিরময় প্রাঙ্গণে ভগ্ন রথ, ছিন্ন পতাকা ও উপেক্ষিত অস্ত্র রাশির মধ্যে স্তূপাকারে মৃতদেহ পতিত, ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন মুণ্ড, কত অলঙ্কার কত রাজমুকুট গড়াগড়ি যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই—আঠার দিনের মধ্যে সব শেষ হইয়া গিয়াছে। দূরে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে মুমূর্ষু দুর্য্যোধন। ভীমের গদা প্রহারে তাঁহার উরুদণ্ড ভগ্ন, তিনি দারুণ যন্ত্রণায় মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন। এই দুর্য্যোধনই এক দিন সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন, ন্যায় ও সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আত্মপুষ্টির ব্যবস্থা করিতেছিলেন। রাজ্য ভাণ্ডার বুক দিয়া জোরে আঁকড়াইয়া অভিমান ভরে বলিয়াছিলেন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও ছাড়িয়া দিব না। আজ দুর্য্যোধনের সমস্ত গিয়াছে মানুষের লালসাই বিশ্বব্যাপারের নিয়ামক নহে, মানবীয় শক্তিই বিশ্বসমস্যার শেষ মীমাংসা করে না। আজ মুমূর্ষু দুর্য্যোধনের তালু পিপাসায় শুষ্ক—এমন এক জনও কেহ নাই যে এই অসময়ে এক বিন্দু শীতল জল দিয়া দুর্য্যোধনের সেবা করে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ নিজ নিজ প্রাণ দিয়াও যাঁহার সেবা করিতেন আজ তাঁহার এই পরিণতি।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম কি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সেই শ্লোকটির আরম্ভ এই রূপ

"ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র"

শ্রীধর স্বামী তাঁহার বিখ্যাত টীকায় বলিতেছেন এই সুন্দর ভাগবত গ্রন্থে ফলের অভিসন্ধি লক্ষণ ধর্ম্ম, এমন কি যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া মানব মোক্ষকামনা করে সে ধর্ম্ম ও নিরস্ত হইল।

পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের যে চিত্র দেওয়া হইল সেই চিত্রখানি মনের মধ্যে উজ্জ্বল ভাবে জাগাইয়া তুলিলে আমরা এই শ্লোকটির মর্ম্ম অতীব সহজে বুঝিতে পারিব।

সকাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান মানবজীবনের একটি সহজ ব্যবস্থা। সংসার অসার,

ইন্দ্রিয়গণ যাহা চায়, যাহা পাইলে মনে হয় যে তাহাদের তৃপ্তি হইবে সে সমস্ত জিনিস কিছুই নহে, ছায়া মাত্র সে সব জিনিস পাইলে অতৃপ্তি কমিবে না বরং জলন্ত হুতাশনে ঘৃতদানের ন্যায় কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনানল আরও প্রবল হইবে অতএব এই মায়াময় জগৎ ছাড়িয়া ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর, এই প্রকারের উপদেশ দেওয়া খুব সহজ কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা মোটেই সহজ নহে অধিক কি সময় উপস্থিত না হইলে এই সমস্তের অসারতা মানব কিছুতেই বুঝিতে পারে না। সুতরাং মানব পার্থিব উন্নতির আশায়, স্বাস্থ্যের আশায়, পুত্রাদির মঙ্গলের আশায়, রূপ ও জয়ের আশায়, যশোলাভের আশায় এবং শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য ধর্ম্মাচরণ করে। ইহাই ধর্ম্ম সাধনার প্রথম অবস্থা। শীঘ্রই অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারে এই পৃথিবীর সুখ ও ঐশ্বর্য্য তাহা যত বেশীই হউক না কেন তাহার স্থায়িত্ব খুব অল্পদিন। সংসারের ভোগের দ্রব্য রাশি রাশি বাড়িয়া থাকে—কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ বয়সের আধিক্যে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে—সুতরাং ভোগ করে কে? ভোগের ইচ্ছা রহিয়াছে—কিন্তু অভিজ্ঞতা বলিয়া দিতেছে এ পৃথিবীতে ভোগের ইচ্ছা মিটিবে না। এই টুকু অভিজ্ঞতা জন্মিলে মানব কেবল পার্থিব সুখ কামনা করে না—স্বর্গসুখের জন্য ব্যাকুল হয়। স্বর্গসুখও ইন্দ্রিয়জ সুখের মতই—তবে তাহা আরও নিবিড়, আরও নির্ম্মল—ও কিছু দীর্ঘস্থায়ী এই পর্য্যন্ত। স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াও মানুষের তৃপ্তি হয় না—তখন সে খুব গভীরভাবে চিন্তা করে—তখনও তাহার অহঙ্কার বেশ থাকে বিশ্ব জগৎ হইতে আমি পৃথক আমার এই স্বতন্ত্রতাটুকু বজায় রাখিবার জন্য খুব চেষ্টা থাকে, কিন্তু সুখে বিরাগ জন্মিয়া যায়। অন্ততঃ পক্ষে পৃথিবীতে ও স্বর্গে যে সুখ পাওয়া যায়, মানব অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারে যে এ সুখ সংস্পর্শজ অর্থাৎ এসুখ স্বাধীন ও অবাধ নহে। ইহা অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করে, ফলে এ সুখের পরিণাম দুঃখ। এই অবস্থায় আসিলে মানুষ ভয়ানক বিরক্ত হইয়া সংসারের কোন জিনিসকে ভাল বাসিতে পারে না, হৃদয় তাহার একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় তখন সে মোক্ষ চায়। সে তখন বলে জগৎ দুঃখময়, জগতের যাহা হয় হউক, আমার তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, আমি আত্মরক্ষা করি। সুখ দুঃখের অতীত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে আত্মরক্ষার প্রয়াস পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নাম কৈতব ধর্ম্ম।

ভগবদ্গীতায় স্বর্গাকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত যে কৈতব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহা নিম্নাধিকারীর জন্য একথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্ম-ফল প্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

২।৪২—৪৪।

"হে পার্থ, বেদে যে অর্থবাদ আছে কেহ কেহ তাহাতেই পরিতুষ্ট। তাঁহারা বলেন, ইহা ছাড়া আর ঈশ্বরতত্ত্ব কিছুই নাই। তাঁহারা কামাত্মা, স্বর্গ পরায়ণ ও মূঢ়। তাঁহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের সাধনভূত, ক্রিয়াবিশেষ-বাহুল্য-বিশিষ্ট এই সব বিষলতাবৎ আপাত রমণীয় স্বর্গাদি ফলশ্রুতি বলিয়া থাকেন। ফলে তাঁহাদের চিত্ত এই সমস্তের দ্বারা অপহৃত হওয়ায় এবং তাঁহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া পড়ায় তাঁহাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে (যোগে) নিবিষ্ট হয় না।"

স্বর্গাকাঙ্খা-পর্য্যন্ত যে কৈতব বা ফলের অভিসন্ধি যুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহার ঊর্দ্ধে অর্জ্জুনকে লইয়া যাইবার জন্য ভগবদ্গীতায় অনেক কথাই বলা হইয়াছে।

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা,
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র-লোকঃ
মশ্নন্তি দিব্যান, দিবি দেব-ভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকঃ বিশন্তি
এবং ত্রয়ীভাব মনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামালভন্তে।" ৯—২০।২১

"বেদত্রয়ের মধ্যে যে সমস্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে তাহাতেই যে সমস্ত লোক রত, তাহারা নানারূপ যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করেন এবং তদ্দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। ঐ সকল ব্যক্তি পুণ্য ফলরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগসকল ভোগ করেন। কিন্তু এই স্বর্গভোগ স্থায়ী নহে। তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখভোগ

করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন, এইরূপে বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কামনাপরবশ হওয়ায় সংসারে গতায়াত করেন।”

স্বর্গাকাঙ্খা পর্য্যন্ত অন্তরে পোষণ করিয়া যে সকাম ধর্ম্ম আচরিত হয় তাহা অপেক্ষা উন্নততর ধর্ম্মের আদর্শ ভগবদ্গীতা অতীব স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন। মোক্ষের অভিসন্ধিকে গীতাশাস্ত্রে খুব স্পষ্টভাবে কোথায়ও নিন্দা করা হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীধর স্বামীর টীকার মর্ম্ম অনুসারে প্রথমেই মোক্ষ পর্য্যন্ত নিরস্ত হইল। শ্রীমদ্ভাগতের এই মর্ম্ম লইয়া পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন।

“তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।

কুরুক্ষেত্রের মহা সমরের পর মোক্ষবাঞ্ছাও যে ধর্ম্ম সাধনার আদর্শ হইতে পারে না—তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে ভাগবত ধর্ম্ম ও তাহার অধিকারী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। ভাগবত ধর্ম্মের অধিকারী সম্বন্ধে ঋষি বলিতেছেন “নির্মৎসরণোং সতাং” শ্রীধর স্বামী ইহার অর্থ করিতেছেন “পরোৎকর্ষা সহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং ভূতানুকম্পিনাং সতাং” অর্থাৎ পরের ভাল দেখিলেই যে তাহা সহ্য করিতে পারে না—যে মানব নিজের সত্ত্বা একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র পদার্থ এইরূপ অনুভব করা ব্যতীত জীবনের অন্য কোন রূপ গভীর অর্থ দেখিতে পায় না, সে মানব ভাগবত ধর্ম্মের অধিকারী নহে। সে ব্যক্তি কোন রূপ কামনা না লইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না। এই প্রকারের মানবগণের জন্য যে ধর্ম্ম বিহিত তাহা অন্যান্য শাস্ত্রে আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সকল লোক-ইত এ প্রকারের নহে, জগতে অন্যরূপ লোক ও আছেন—সেই সমস্ত লোকের আচরণীয় যে ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে সেই পরম ধর্ম্মই বর্ণিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্য যতদিন আপনার সত্ত্বাকে একটি পৃথক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করে, ততদিন নিজের লাভের জন্য নিজের সুখ ও সম্ভোগের জন্য অথবা পরলোকে স্বর্গাদির জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। ইহা নিম্নাধিকারীর ধর্ম্ম, কিন্তু তাই বলিয়া উপেক্ষণীয় বা নিন্দনীয় নহে। মানবাত্মার অভিব্যক্তির ইতিহাসে ইহার একটা চিরন্তন স্থান আছে। শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের “প্রোজ্ঝিত” শব্দের, ‘প্র’ এই উপসর্গটির অর্থ নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন “প্র শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্ত।” জগতের যাহাই হউক না কেন আমি নিজে মোক্ষলাভ করিয়া এই জন্মজরামৃত্যু সমাকীর্ণ সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করি, এই প্রকারের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা এই নিম্নাধিকারের শেষ

কথা। ভাগবতশাস্ত্রের প্রথমেই বলা হইল যে মানব যতদিন আপনাকে একটি স্বতন্ত্র সত্বা বলিয়া বিবেচনা করিবে, যতদিন সে বিশ্বের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে সক্ষম না হইবে, বিশ্বমানবের ও নিখিল বিশ্বের ঐক্য, যতদিন তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সত্য বলিয়া বিবেচিত না হইবে যতদিন সে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারিবে যে ভগবানের জন্যই জীবন বহন করিতে হইবে, ততদিন সে এই উদার ও মধুর ভাগবত ধর্ম্মের অধিকারী নহে। শ্রীধরস্বামী এই দ্বিতীয় শ্লোকেরই টীকায় বলিয়াছেন "কেবলমীশ্বরারাধন লক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে।" অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনাই যে ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষণ, তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম।

শ্রীধরস্বামী এই ভাগবতধর্ম্মের অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "ভূতানুকম্পিনাং সতাং"। 'অনুকম্পা' বলিলে আমরা 'দয়া' বুঝি। কথাটা একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। অনুকম্পার মৌলিক অর্থ কি? একজন মানব যখন কেবল আর একজন মানবের কেন অপর কোন প্রাণীর প্রাণশক্তির ও হৃদয়বৃত্তির প্রত্যেক স্পন্দন নিজের প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতে পারেন, মনুষ্য যখন নিজের ব্যক্তিত্বের বাহিরে আসিয়া বিশ্বপ্রাণের সহিত নিত্যকালব্যাপী একাত্মতা অনুভব করেন, তখনই বলিতে পারা যায় তাঁহার হৃদয়ে 'অনুকম্পা'-বৃত্তি কার্য্য করিতেছে। এই বৃত্তিই ভগৎ-প্রেমের অঙ্কুর—যাহার সম্বন্ধে চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল সে দুখপুর"—কথাটি কি সুন্দর, কি ভাবপূর্ণ! মনে করুন একটি ছোলা বা মটর, সে নিজের আবরণের মধ্যে অন্ধকারে বদ্ধ হইয়া যেন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হঠাৎ যখন তাহার অঙ্কুর বাহির হইল তখন সে নিজের সীমার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া অনন্ত আলোকরাজ্যের মুক্ত বায়ুর মধ্যে উদার আকাশের তলে আসিয়া প্রবেশ করিল।

এইবার কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান মানসপটে একবার চিত্রিত করিয়া তুলিলেই আমরা ভাগবত-ধর্ম্মের ভিত্তিটা কি তাহা বুঝিতে পারিব। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে আমরা দণ্ডায়মান হইলে যদি কোন অনন্ত শক্তিমান পুরুষ আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলেন, "মানব তুমি পৃথিবীর রাজ্য পাইবে, ঐশ্বর্য্য পাইবে, ধর্ম্মাচরণ কর, জীবনের ভার বহন করিয়া অগ্রসর হও।" তখন আমরা তাঁহার কথার কি উত্তর প্রদান করিব, কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের মহতী শিক্ষা যদি আমরা হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি তাহা হইলে আমরা বলিব

"মহাশয়, মাপ করিবেন, পার্থিব বিভবের যাহা শেষ তাহা ঐ দেখুন চারিদিকে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে—আমাদের বঞ্চনা করিবেন না।" তখন সেই শক্তিমান পুরুষ যদি আমাদিগকে বলেন "আচ্ছা পৃথিবীর সুখের ও ঐশ্বর্য্যের নশ্বরতা দেখিয়া তুমি বিহ্বল হইয়াছ, তবে তোমাকে স্বর্গ দিব তুমি জীবন ধারণ কর, ধর্ম্মাচরণ কর।" এ কথার উত্তরে আমরা বলিব "স্বর্গ! এই সব রাজা আজ যাহাদের অগুরুচন্দন নিষেবিত সুন্দর ও বীরত্বের লীলা-নিকেতন মহার্ঘ্য বসন ভূষণ শোভিত দেহগুলি শৃগাল কুক্কুর ও শকুনিগৃধিনী নির্ভয়ে ভক্ষণ করিতেছে, এই সমস্ত রাজাদেরই প্রতাপে একদিন সমস্ত স্বর্গ কম্পিত হইয়াছে—এইত স্বর্গ! আবার স্বর্গেরও যখন ক্ষয় আছে, তখন একদিন না একদিন সেখানেও ত এই দৃশ্য দেখিতে হইবে। না হয় এক মন্বন্তর স্বর্গ সুখ ভোগ করিলাম, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় সে কতটুকু সময়? অতএব মহাশয়, এবারেও মাপ করিবেন, স্বর্গ দেখাইয়া বঞ্চিত করিবেন না।" তখন হয়ত সেই মহাপুরুষ বলিবেন, "আচ্ছা, তুমি বুঝিয়াছ সুখ, ঐশ্বর্য্য ক্ষয়শীল—সকল প্রকার দ্বন্দ্বই ক্লেশের কারণ; আচ্ছা চল তোমাকে সুখ ও দুঃখের ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতেছি তুমি মুক্তি পাইবে, ধর্ম্মাচরণ কর জীবনের ভার বহন কর।"

মহাপুরুষের এই কথা শুনিয়া হয়ত আমাদিগকে মুহূর্ত্তকাল ভাবিতে হইবে। হয়ত একবার মনে হইবে বেশ ত, এ অতি সাধু প্রস্তাব, মহাপুরুষের কথায় সম্মত হওয়া যাউক। কিন্তু এ ভাব কেবল মুহূর্ত্তের জন্যই আমাদের মনে জাগিবে। ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না। দূরে শত শত রমণী পতিহীনা হইয়া আলুলায়িত কেশে ভূমে গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছে, ঐ কত রাজনন্দন পথের ভিখারী হইয়াছে, কত মাতা পুত্রহীনা হইয়া বিলাপ করিতেছে, কত সোণার সংসার শ্মশান হইয়া গেল, তাহা ছাড়া মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, পিপাসিতের জলভিক্ষা আমাদের কর্ণে আসিয়া বাজিবে, ঐ অনুকম্পাবৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে; মনে হইবে হায় এ জীবনে কি প্রয়োজন, যদি জীবন দিয়াও একজনের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারি, যদি জীবন দিয়াও একজন শোকগ্রস্তের হৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও সান্ত্বনা আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলেও সে জীবন ধন্য হয়। সুতরাং আমরা কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে দাঁড়াইলে আমাদের মোক্ষগ্রহণেও ইচ্ছা হইবে না। এই 'ভূতানুকম্পা' প্রভাবে নিখিল বিশ্বের সহিত আমরা আমাদের এমন একটা অপূর্ব্ব যোগ দেখিতে পাইব যে জগৎ ছাড়িয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে।

এই অবস্থার যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মের লক্ষণ 'ঈশ্বরের' আরাধনা—ঈশ্বর—যিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত—তাঁহার প্রতি চাহিয়াই জীবনের ভার বহন করিব—অন্ততঃ পক্ষে তাহা ছাড়া আর উপায় নাই—ভাগবত শাস্ত্র সেই পরম ধর্ম্মই শিক্ষা দিবেন।

সুধী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

লণ্ডন নগরে বর্ত্তমান সময়ে মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমূহের যে মহা-সম্মিলন (Race Congress) হইতেছে, তাহা বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। সকল দেশের ও মানব জাতির সকল শাখার অন্তর্ভূত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-ব্যক্তিগণ বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইয়া মানব জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমূহের অতীত, বর্ত্তমান ও বহুদূর বিস্তৃত ভবিষৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন,—মানবের ইতিহাসে এমন দিন গিয়াছে যখন এ প্রকারের আলোচনা কবি-কল্পনাতেও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত। এক যুগে যাহা স্বপ্ন, অন্য যুগে তাহাই সাধনা, এবং পরবর্ত্তী যুগে তাহাই সত্য; ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের দিকে চাহিয়া এই ধারণাই আমাদের মনে বলবতী হইতেছে।

বঙ্গের গৌরবস্থল সুধী ব্রজেন্দ্রনাথ এই সম্মিলনীতে সর্ব্ব প্রথম বক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন—অর্থাৎ মানব জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা সম্বন্ধীয় প্রাথমিক সমস্যাগুলির মীমাংসার ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে। মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা (Races) সমূহের উৎপত্তি, পৃথিবীর নানা অংশে নানা ভাবে নানা যুগে তাহাদের বিস্তৃতি, শাখা সমূহের প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া তিনি আলোচনা করিবেন। তৎপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান রাজনীতির দিক হইতে, মানব জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখাগুলি কিরূপে রাজনীতিক জাতিতে (Nation) এ পরিণত হইতেছে, Nationalism, Imperialism, Federa-lionism প্রভৃতির মধ্য দিয়া কিরূপে বিশ্বমানব তাহার মূলগত ঐক্যের একটা সচেতন উপলব্ধির দিকে ছুটিয়াছে, তাহাও তিনি সংক্ষেপে বলিয়াছেন। তিনি "RACE ORIGINS: Fundamental Considerations touching the Physical Basis of Race" নামক প্রবন্ধ হস্তে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন সম্মুখে আজ ঘোষণা করিয়াছেন "Our motto is Harmony" "মিলনই আমাদের মূল মন্ত্র।"

বর্ত্তমান সম্মিলনী (The First Universal Races Congress

তাঁহাকে প্রথম বক্তা রূপে নির্দ্দেশ করা ব্যতীত তাঁহাকে আরও একটি বিশেষ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন! সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হইয়া তিনিই এই সভা মণ্ডপের দ্বার প্রথম উদ্ঘাটন করিবেন। সমবেত সাধারণ সুধীমণ্ডলী হইতে ইহাই তাঁহার পৃথক ও বিশেষ সম্মান। মানব জাতীর ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমূহের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া যাঁহাকে একবাক্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রতিনিধিত্বে বরণ করিলেন, তাঁহার মধ্যে তাঁহার দেশবাসীগণ যে কি গৌরব অনুভব করিতেছেন তাহা ভাষায় সম্যক প্রকাশ করা যায় না। যিনি পৃথিবীর সকল দেশের সুধীগণের বরণীয় হইয়াছেন—সেই বরপুত্রের প্রতি তাঁহার জন্মভূমি কি দৃষ্টিতে আজ চাহিয়া আছেন—তাহা কোন্ ভারতবাসী না মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবেন।

সুধী ব্রজেন্দ্রনাথ, কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত পরলোকগত উকীল বাবু মহেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ব্রজেন্দ্রনাথের পিতা শুধু ব্যবহার জীব ছিলেন না, ইউরোপীয় ভাষায় (ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান ও স্পেনিস্) তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। মানবসেবা—ধর্ম্মী সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক 'কোমৎ' এর উপদেশ তাঁহার জীবনে বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের পিতা ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। পিতার অকাল মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহ সাত বৎসরের বালক ব্রজেন্দ্রনাথ এক মহা বিপদের মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে তাঁহারা অতি কষ্টেই ছিলেন। হায়, দারিদ্র্যের কশাঘাতে না জানি ভারতবর্ষে কত ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাইতেছে না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ব্রজেন্দ্রনাথ যে বৃত্তি পান, তাহাতে তাঁহার অধ্যয়ন বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল।

যখন ব্রজেন্দ্রনাথ ৪র্থ শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন গ্রীষ্মাবকাশের সময় তিনি বীজগণিত (Algebra) ও জ্যামিতি শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। একমাসের মধ্যেই তিনি বীজ গণিতের বাইনোমিয়াল্ থিওরেম্ ও সংখ্যাতত্ত্ব (Theory of Numbers) শেষ করিয়া ফেলেন! এক জন ৪র্থ শ্রেণীর বালকের এরূপ প্রতিভার পরিচয় অত্যন্ত বিরল। কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাক্তার হেষ্টির সংস্পর্শে আসেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিবার সময় একদিন ব্রজেন্দ্রনাথ ডাক্তার হেষ্টির নিকট তর্কশাস্ত্রের (Logic) একখানি অতি কঠিন পুস্তক চাহেন। ডাক্তার হেষ্টি তাঁহাকে বলিলেন যে এই পুস্তক অত্যন্ত কঠিন,তুমি

তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিবে না। ব্রজেন্দ্রনাথ ছাড়িবার পাত্র নহেন, বালকের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে ডাক্তার হেষ্টি অগত্যা তাঁহাকে পুস্তকখানি দিলেন। তিনি চারিদিন পরে ব্রজেন্দ্রনাথ পুস্তকখানি প্রত্যর্পণ করিলে পর ডাক্তার হেষ্টি বলিলেন, "কেমন, যাহা বলিয়াছিলাম তাহা ঠিক কি না? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখন তুমি এই পুস্তকের কিছুই বুঝিতে পারিবে না।"

অধ্যক্ষের এই কথা শুনিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি ইহার সমস্তই পড়িয়াছি ও বুঝিয়াছি!" তখন ডাক্তার হেষ্টি বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথ যে কেবল গ্রন্থখানি আগাগোড়া পড়িয়াছেন তাহা নহে, তিনি গ্রন্থখানিকে রীতিমত সমালোচকের ন্যায় আয়ত্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ব্রজেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে তিনি যখন কোনও মৌলিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, তখন ঐ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে স্বতঃই তাঁহার মনে এত দিক হইতে এত প্রকারের সমালোচনা আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাঁহাকে আর অন্য লেখকের সমালোচনা পড়িতে হয় না। তাঁহার অধ্যয়নে অভিনিবেশ ও বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। এমন কতদিন দেখা গিয়াছে যে তিনি সন্ধ্যায় পড়িতে বসিলেন এবং যখন তাঁহার পাঠ শেষ হইল তখন দেখিলেন সূর্য্যের কিরণে দিঙ্মণ্ডল ভরিয়া গিয়াছে।

দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি মানব জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই তিনি মৌলিক গবেষণা সহ অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। শুনা যায় তাঁহার মত জ্ঞানী প্রাচ্য ভূখণ্ডে বেশী নাই। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তিনি তাঁহার জ্ঞানের তুলনায় জগৎকে অধিক কিছু দেন নাই।

খৃষ্টান ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের তুলনা বিষয়ক মৌলিক গবেষণা পূর্ণ পুস্তকের ভূমিকায় তিনি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক বিচার পদ্ধতির (Historico Comparative Method) ভ্রম—সংশোধন উপলক্ষ্যে 'হার্ব্বার্ট স্পেনসারে'র বিবর্ত্তন-বাদের ও 'হেগেল' দর্শনের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের কোন কোন অংশ অতি স্পষ্টাক্ষরে ভ্রমাত্মক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা হইতে হিন্দু, চীন, মুসলমান প্রভৃতি প্রাচ্য ভূখণ্ডের সভ্যতাগুলির মর্ম্ম যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিতে হইবে তাহাও সংক্ষেপে বলিয়াছেন।

তাঁহার আর একখানি গ্রন্থের নাম New Essays in Critcism

(সমালোচনা বিষয়ক নূতন প্রবন্ধাবলী) এই গ্রন্থে তিনি কাব্য ও ললিতকলার (Art movement) অভিব্যক্তি সম্বন্ধে জার্ম্মান দার্শনিক সুপ্রসিদ্ধ হেগেলের মতের দোষ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সাহিত্য এক স্তর হইতে অন্য স্তরে (Stage) পৌঁছিবার পূর্ব্বে একটা "Transfiguration এর মধ্যে দিয়া যায়। অত্যাধিক ভাবপ্রবণতাই (Emotion) এই অবস্থার প্রাণ স্বরূপ। সাহিত্যের যে তৃতীয় স্তর, হেগেল তাহার নাম দিয়াছেন Romantic Stage হেগেলের মতে এই স্তরের পর যে ভাব প্রবণতার যুগ আসে, তাহারই নাম Religion (ধর্ম্ম ?)—ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলের এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে Neo-Romantic Movement সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ অত্যন্ত গবেষণা পূর্ণ।

"Scientific Method of the Hindus" (হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি) প্রবন্ধে তিনি সাংখ্য দর্শনের বিবর্ত্তনের প্রণালী ও স্পেন্সারের বিবর্ত্তনের প্রণালী, এবং হিন্দু ন্যায় ও মিল'এর তর্কশাস্ত্র (Logic) ইহাদের তুলনা মূলক বিচার করিয়াছেন !

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথের মত এই যে বর্ত্তমান যুগের তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং ভবিষ্যত ভারত তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবে।

"Physical Basis of Race" নামক নামক যে প্রবন্ধ তিনি বর্ত্তমান সম্মিলনীর জন্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি Centre of man's first Appearance (মানবের প্রথম আবির্ভাবের কেন্দ্র) বিষয়ে অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। অন্ততঃ জিডিংস (Giddings) প্রভৃতি আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান-বিৎগণের সহিত অনেক স্থলেই তাঁহার মতের মিল হয় নাই। Cultural Race সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা Gidding প্রভৃতির গ্রন্থে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু National Race সম্বন্ধে বিশেষতঃ National Personality ও Universal Humanity (জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্বমানব) এতদুভয়ের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলকে অনুসরণ করিলেও অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অন্য বিশেষ কিছু আমরা অবগত নই। আজ তাঁহার যশঃসৌরভ সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপী হইলেও একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে ব্রজেন্দ্রনাথের কার্য্য এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে—

তাঁহার জ্ঞান ও প্রতিভার তুলনায় তিনি এখনও বিশেষ কিছু করেন নাই।

বাঙ্গালাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যরূপে নির্ব্বাচন করেন নাই, সরকারী মনোনয়নের পদ্ধতি ছিল বলিয়াই আজ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য হইতে পারিয়াছেন। এই ঘটনা হইতে কোনও একজন শ্রদ্ধাস্পদ লেখক নির্ব্বাচন [election] অপেক্ষা মনোনয়নের (nomination] শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এজন্য গ্রাজুয়েটদিগের দোষ দেওয়া ও মনোনয়নের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে চেষ্টা করা নিতান্ত অসমীচীন হইয়াছেন। আমরা জানি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মত মনীষিও দ্বিতীয়বার পার্লিয়ামেণ্টে নির্ব্বাচিত হয়েন নাই।

আমরা আশা করি নির্ব্বাচিত না হওয়ায় ব্রজেন্দ্রনাথ বিশেষ দুঃখিত হন নাই এবং এজন্য তিনি নিজে যতটা দায়ী গ্রাজুয়েটগণ ততটা নহে। আসল কথা, ব্রজেন্দ্রনাথের কার্য্য এখনও যথার্থভাবে আরব্ধ হয় নাই—দেশ এখনও তাঁহার প্রতি আশায় চাহিয়া আছে।*

বীরভূমে গালার কারবার,

(১)

ইলামবাজার।

বীরভূমের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পদ এক সময়ে ইহার অধিবাসীগণের কোষাগারে প্রচুর অর্থ আনিয়া দিয়াছিল। যে সমস্ত কারবারের জন্য বণিক সমাজে বীরভূমের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, ইলামবাজারে গালার কারবার তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ইলামবাজার গ্রাম খানি আজকাল, তাহার গৌরবময় অতীতের কীর্ত্তি চিহ্ন সমূহ ধারণ করিয়া নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। ইহার বিভিন্ন পটি এখন জনকোলাহল হীন; কোন কোন 'পটি' এখন নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। পরিত্যক্ত কুঠীসমূহ এখন বিদেশীর বাসভবনে পরিণত হইয়াছে, এবং কুঠীয়াল সাহেবগণের আবাস গৃহগুলি গ্রাম্য রাজকর্ম্মচারীগণের বিশ্রামালয়রূপে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। দারিদ্র্য যেমন, নানা

* ব্রজেন্দ্রনাথ যে সমস্ত মত সভ্যজগতকে দান করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশে বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত। আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব। এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রবন্ধ বলিয়াই সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইল না। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মূর্ত্তিতে ইলামবাজারকে আক্রমণ করিয়াছে, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীও সময় বুঝিয়া তাহার দোসর হইয়াছে।

ইহা বেশী দিনের কথা নহে যখন ইলামবাজার বীরভূম জেলার মধ্যে একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল; অন্য কোন শিল্প সম্ভারের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক গালার কারবারের জন্যই এই গ্রামটির নাম সাগর পারেও সুপরিচিত ছিল। সততা ও পরস্পর বিশ্বাস এই দুইটির অভাব হেতু ইলামবাজারের সুপ্রতিষ্ঠ নামে যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে তাহা যে শীঘ্র মুছিয়া যাইবে সেরূপ মনে হয় না। অবশ্য নীল কুঠির পতনটা প্রাদেশিক ভাবেই হইয়াছিল এবং তসর ও সুতি কাপড়, কাঁসার ও পিতলের বাসন প্রভৃতির উৎপত্তির অল্পতাও অনেকটা প্রাদেশিক। কিন্তু গালার কারবারে ইলামবাজার যে একচেটিয়া আসন অধিকার করিবার উপক্রম করিয়াছিল, কারবারীগণের লোভাধিক্যই তাহার একমাত্র অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছিল।

এখন দুইটিমাত্র লোকের বাড়ীতে অতি অল্প পরিমাণে গালা তৈয়ারী হয়; তবে এ ব্যবসাটা তাহাদের গৌণ এবং সেইজন্য ইহা পরিচালনে তাহাদের তাদৃশ অনুরাগ দেখিতে পাইলাম না। এখনও যে 'পাতগালা' বাচড়াগালা কারিগরগণ প্রস্তুত করিতেছে তাহা বাজারে অন্য স্থান হইতে প্রস্তুত গালা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

পূর্ব্ব কথা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যখন ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের দৃষ্টি এই ব্যবসায়ের দিকে পতিত হয়, তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইলামবাজারে গালা প্রস্তুত হইতেছে। কতদিন বা কোন সময় হইতে ইলামবাজারে এই কারবার প্রতিষ্টিত আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারা যায় নাই। তবে ইহা যে প্রায় পাঁচ শত বৎসর হইতে তথায় প্রচলিত, তাহা কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে।

লাক্ষা।

পূর্ব্বে বীরভূম জেলার সেনভূম পরগণার 'লাহা মহল' নামে কয়েকটি জঙ্গল মহলে লাক্ষার চাষ হইত। এখন বীরভূমে লাক্ষার চাষ হয় না বলিলেই হয়। যখন ইলামবাজারে গালার কারবার অতিশয় প্রসার লাভ করিয়াছিল তখন বীরভূম ব্যতীত, সাঁতলাল পরগণার পাকুড় মহকুমা হইতে, এবং সিংহভূম, মানভূম, এবং হাজারিবাগ জেলা হইতেও ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ রাজ্য হইতে, লাক্ষার

আমদানী হইত। এখনও একমাটি জেলা হইতেই প্রধানতঃ লাক্ষা রপ্তানী হয়।

লাক্ষা, কুসুম গাছেই ভাল উৎপন্ন হয়; শাল, পলাশফুল এবং পাকুড় অর্থাৎ অশথ গাছেও লাক্ষার চাষ বেশ ভাল হয়। প্রথমতঃ লাক্ষার রং সাদা থাকে, এই সময়ে অসংখ্য লাক্ষার পোকা (Coccus Lacca) গাছের সরু সরু ডালের চারিধারে জড়াইয়া ধরে এবং একপ্রকার লালা নির্গত করে; ক্রমে এই লাক্ষা পোকা মরিয়া যায় এবং লালা সংযুক্ত হইয়া দৃঢ় হইয়া যায়। ইহাই লাহা। সাঁওতাল এবং ইতর শ্রেণীর হিন্দুরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লব-গুলি গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া লয় এবং কাঠিগুলি ছাড়াইয়া লইয়া মহাজনদিগকে বিক্রয় করে। এই অবস্থায় লাক্ষার রং কমলানেবুর শুষ্ক খোসার রংএর মত হয়।

গালা প্রস্তুত প্রণালী।

ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের আমলেও বীজ হইতে গালা তৈয়ারী করিবার জন্য কোনরূপ বাষ্পীয় যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত না। Erskine সাহেব বা Campbell এবং Farquhar-son কোম্পানী খোলা ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাতে প্রকৃতপক্ষে, কতকগুলি কারিকর লইয়া, একত্র এবং একস্থানে কার্য্য হইত। সাহেবী কোম্পানী হইবার পূর্ব্বে এবং তাহার পরেও, সুরী এবং অন্যান্য জাতি মহাজনদের নিকট দাদন লইয়া স্বাধীন ভাবে লাক্ষা হইতে গালা এবং গালার রং (lacdye) প্রস্তুত করিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এখন মাত্র ২টি পরিবারে গালা তৈয়ারী করিবার কারখানা আছে; lacdye তৈয়ারী হয় না, তবে গালা প্রস্তুত করিবার সময় যে রং পাওয়া যায়, তাহাতে আল্তা রং করা হয়।

গালা প্রস্তুত পূর্ব্বাপর সম্পূর্ণ দেশীয় প্রণালীতেই সম্পন্ন হইত, এখনও শ্রীবাগালচন্দ্র লাহা এবং শ্রীরাখালচন্দ্র লাহার কারখানার দেশীয় প্রণালীই অবলম্বিত হয়। আমরা এই প্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এই প্রণালীতে ২জন কারিগর একদিনে এক মণ গালা তৈয়ারী করিতে পারে।

এই প্রণালীর প্রথম কার্য্য হইতেছে—সংশোধন। কাঁচা লাহা যে আকারে আমদানী হয় তাহাতে কাঠের কুচি প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। প্রথমতঃ এই কাঁচা লাহাকে বৃহদাকার শিলের উপর রাখিয়া বড়বড় নোড়া দিয়া চূর্ণ করা হয়। এই কার্য্য স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকে; এই চূর্ণ, তাহার

পর, প্রশস্ত জলপূর্ণ মৃৎপাত্রে নিক্ষেপ করা হয়। বীরভূম জেলায় এই সমস্ত পাত্রকে 'নাদ' বা 'পাত্‌না' বলিয়া থাকে। ২৪ ঘণ্টা কাল চূর্ণ লাহাকে পাত্‌নায় ভিজাইয়া রাখা হয়। তাহার পর চূর্ণ লাহা ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় পিষ্ট হয় এবং পুনরায় জলে নিক্ষিপ্ত হয়। তিনবার এইরূপ করা হইলে পর, সাজিমাটির সহিত মিশাইয়া পুনরায় লাহাকে পেষন করিয়া জলে ভিজাইয়া আবার ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহাও তিনবার করিবার নিয়ম। তবে button lac বা 'বড়া' গালা তৈয়ারী করিতে হইলে সাজিমাটির সহিত মিলাইবারপর মাত্র ১ বার এবং shellac বা 'পাত' গালা তৈয়ারী করিতে হইলে দুই তিন বার জলে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। লাহা তুলিয়া লইবার পর নাদে যে জল থাকে, তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় না; এই সংশোধনাবশিষ্ট জল হইতে পূর্ব্বে গালার রংএর বড়ি, lacdye তৈয়ারী হইত এবং অধুনা ইহাতে আল্‌তা রাঙান হয়। ইহার কথা পরে বলিব।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কাঁচা লাহা একপ্রস্ত শোধিত হইলে পর, ইহাকে 'জৈ' বলে। এই 'জৈ' ১০।১২ হাত লম্বা শক্ত কাপড়ের থলেতে ভরা হয়। পূর্ব্বে যে চূর্ণ করার কথা বলিলাম, তাহাতে কাঁচা লাহাকে মিহি আকারে আনা যায় না। শোধিত হইবার পর যে কাঁচা লাহা কাপড়ের থলেতে প্রবেশ করে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকরের আকারে থাকে। পাত্‌লা হইতে শেষবার তুলিবার সময় ইহার রং গিণিসোনার মত থাকে; শুষ্ক করিবার পর গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ হয়। থলে ভর্ত্তি হওয়ার পর ইহাকে Furnace বা চুল্লির নিকট লইয়া যাওয়া হয়। Furnace শুনিয়া কেহ যেন বড় একটা কিছু কাণ্ড মনে না করেন। এগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র এবং সাধারণ রকমের। ৪ হাত প্রস্ত একটি লম্বা একচালায় সারি সারি এই চুল্লিগুলি সাজানো থাকে। দেওয়ালের সংলগ্ন একটি করিয়া গর্ত্ত করা হয় এবং এই গর্ত্তে কাঠের কয়লা জ্বলিতে থাকে। গর্ত্তের এক পাশে দেওয়াল এবং অপর পাশে দেড় হইতে দুই ফুট উচ্চ অর্দ্ধ চন্দ্রাকার একটি দেওয়াল থাকে। ইহাই হইল furnace বা চুল্লি। কাপড়ের থলেটির একপ্রান্ত চালার দেওয়ালে আটকান থাকে; একজন কারিকর অর্দ্ধচন্দ্রাকার ক্ষুদ্র দেওয়ালের নিকট বসিয়া, লাহাপূর্ণ থলেটি আগুনের উপর ঘুরাইয়া তাত্‌ দিতে থাকে। চুল্লি হইতে ঈষৎ দূরে ডান দিকে ঢালাই করিবার একটি যন্ত্র থাকে। ইহা একধারে ঢালাই করিবার এবং শীতল করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গালার প্রকার ভেদে এই যন্ত্র দুইপ্রকার; shellac বা পাতগালা প্রস্তুত

করিতে হইলে মাটির "কলাগাছ" আবশুক হয়; button lac বা বড়াগালা প্রস্তুত করিবার সময় আস্ত কলাগাছ ব্যবহার করা হয়।

থলে মধ্যস্থ লাহা চুল্লির উত্তাপে ক্রমশঃ নরম হইয়া তরল আকারে পরিণত হয়। এই অবস্থায় কারিকর তাহা মাটির কলাগাছের উপর নিঙড়াইতে থাকে। মাটির কলাগাছ একপ্রকার মৃত্তিকা নির্ম্মিত লম্বা ও সরু ঢাক মাত্র। ইহার আকার অনেকটা কামানের মত। অতি পুরাকাল হইতেই বাঁকুড়া জেলাস্থ সোণামুখী গ্রামনিবাসী কুম্ভকারগণই এই মাটির কলাগাছ নির্ম্মান করিয়া আসিতেছে। এই মৃণ্ময় ঢাক অতিশয় মজবুত; ইহার উপরিভাগে একপ্রকার মাটির প্রলেপ থাকে, তাহা অত্যন্ত মসৃণ ও শীতল; এই মাটির ঢাকের রং বাদামী। ইদানীং রাণীগঞ্জের পটারি কারখানায় এইরূ ঢাক নির্ম্মিত হইতেছে; মির্জ্জাপুরের গালার কারখানায় এই ঢাক ব্যবহৃত হয়।

যাহাহউক, থলে হইতে নিঙড়াইয়া গালা যেমন মাটির কলাগাছের উপর ফেলা হয়, অপর একজন কারিকর কোঙা ন'মক গাছের পাতার ছিল্‌কে দ্বারা তাহা ঐ তিন হাত লম্বা কলাগাছের অর্থাৎ ঢাকের উপর, ক্ষিপ্রহস্তে সমান ভাবে বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়। ঠাণ্ডা হইবামাত্র এই গালার প্রলেপটি টানিয়া লওয়া হয়; ইহাই হইল পাত গালা। একবার ঢালিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ ঢাকটির উপরিভাগ সিক্ত বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া দেওয়া হয়, এবং কোঙার ছিল্‌কে দিয়া চালাইবার সময় ছিল্‌কেটিকে বার বার জলে ভিজাইয়া লওয়া হয়।

বড়া গালা—button lacএর বাংলা কিনা ঠিক করিতে পারা যায় না। তবে বড়া গালার যে নমুনা দেখিলাম তাহা হইতে বড়া গালা হইতেই button lac কথাটার উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা; কারণ button lac এর আকৃতি অবিকল বড়ার মত। বড়া গালা তৈয়ারী করিবার সময়, একটি আস্ত কলাগাছের কাণ্ডটির উপরের কয়েক পর্দ্দা আবরণ ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং পূর্ব্বোক্ত মাটির ঢাক তুলিয়া লইয়া, ৩।৪ হস্ত পরিমাণ এই কাণ্ড স্থাপিত হয়। প্রথম কারিকর বস্ত্র মধ্যস্থ গালা পাক দিয়া বড়ি দেওয়ার মত করিয়া কলাগাছের উপরে ফেলিতে থাকে এবং দ্বিতীয় কারিকর তাহা তুলিয়া লইতে থাকে।

ইলাম বাজারে এখন যে দুইটি পরিবারে গালা প্রস্তুত হইতেছে তথায় মাসে গড়ে ১৫ মণ করিয়া গালা উৎপন্ন হয়। বাজারে ইহার দর মণকরা ৩২।৩৩৲ টাকা। যত উৎপন্ন হয় ততই বিক্রয় হয়, তৈয়ারী হইয়া মজুত থাকিতে দেখা যায় না।

গালার রং। Lac dye.

গালার রং এখন আর প্রস্তুত হয় না; বস্তুতঃ এককালে গালা প্রস্তুত অপেক্ষা গালার রং প্রস্তুত করা বেশী লাভবান ব্যবসায় ছিল। সেই জন্য ইহাতে ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের দৃষ্টি পতিত হয়। কাঁচালাহার শোধনাবশিষ্ট রঙিন জল হইতে সাহেবেরাই প্রথমতঃ রংএর বড়ি প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইলামবাজারের অধিবাসীগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। দুইটি প্রধান কারণে রংএর কারবারের ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাকে, প্রধান কারণ ইউরোপে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত ম্যাজেণ্টা প্রভৃতি রংএর প্রচলন, আর দ্বিতীয় কারণ আমাদের ব্যবসায়ীগণের লোভাধিক্য এবং সততার অভাব।

নীলের বড়ি যে উপায়ে তৈয়ারী হইত, গালার রংএর বড়িও প্রায় সেই রকম প্রণালীতে প্রস্তুত হইত। যে সমস্ত কারখানায় গালার সহিত রংও উৎপন্ন হইত তথায় কাঁচা লাহা ভিজাইবার জন্য নাদ বা পাতনা স্থিত অপরিষ্কার রঙিন জল বড় বড় চৌবাচ্চায় রক্ষিত হইত। সর্ব্বসমেত ৪টি চৌবাচ্চা থাকিত; প্রথমটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং গভীর, ইহার ডান দিকে আর একটি অল্প গভীর এবং আয়তনে ছোট চৌবাচ্চা থাকিত, এই দুইটির পাশাপাশি আরও দুইটি স্বল্প গভীর কুণ্ড থাকিত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কাঁচালোহা প্রথমে তিন বার ধৌত লইলে পর সাজিমাটির সহিত তাহাকে চূর্ণ করা হইত। রং তৈয়ারী করিতে হইলে প্রথম তিন বার ধৌত করিবার পর যে জল থাকিত তাহাই পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডে রক্ষিত হইত। সাজিমাটি মিশ্রিত জল লওয়া হইত না।

বড় কুণ্ডটিতে রক্ষিত রঙিন জল কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতার দ্বারা খুব আলোড়িত হইত। ৪।৫ দিন এই রূপ অবস্থায় থাকিত; স্থির হইলে, উপরে জলীয় অংশ ভাসিয়া উঠিত এবং নীচে রংএর পলি পড়িয়া যাইত। এই কুণ্ডের উপরে দ্বিতীয় কুণ্ডের দিকে একটি tap বা জল নির্গমের সংকীর্ণ নল থাকিত; এই ট্যাপ খুলিয়া দিলে উপর কার জলীয় অংশ দ্বিতীয় কুণ্ডে গিয়া পড়িত। জলীয় অংশ সমস্ত বাহির হইয়া গেলে, প্রথম কুণ্ডের পাশের স্থিত কুণ্ডের দিকের ট্যাপ খুলিয়া দেওয়া হইত। এই তৃতীয় কুণ্ডের উপরে আড়া আড়ি ভাবে একটি বাঁশের মাচা রাখা হইত এবং তাহার উপরে একটি শক্ত বস্ত্র বেশ জোরে টানিয়া রাখা হইত। রংএর পলি ইহার উপর পতিত হইত এবং সম্পূর্ণ জলীয় অংশ কুণ্ড নিম্নে চলিয়া যাইত। আবার দ্বিতীয় কুণ্ডে যে জল

পতিত হইত তাহার সহিত যে রংএর পদার্থ মিশান থাকে তাহাকেও বাদ দেওয়া হইত না। এই দ্বিতীয় কুণ্ডের উপর দিকের ট্যাপ দিয়া জলীয় অংশ নালায় পড়িত এবং নিম্নের ট্যাপ দিয়া রঙিন অংশ চতুর্থ কুণ্ডে, তৃতীয় কুণ্ডের স্থায় রক্ষিত হইত। বস্ত্রাবৃত রঙিন পলির উপর কিছু চূণের জল ছিটাইয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রেস্ বা চাপ যন্ত্রে সংগৃহীত হইয়া জাঁত দেওয়া অবস্থায় থাকিত। কঠিন আকার ধারণ করিলে এই রংকে rolling cutter বা রুল দিয়া কাটিয়া বাড় আকারে পরিণত করা হইত। রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক হইয়া ইহাই হইত রংবড়া lacdye।

পূর্ব্বে শোধনাবশিষ্ট রঙিন জলের সহিত শতকরা ৬ ভাগ রজন মিশ্রিত করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু কালে এই প্রথায় অপব্যবহার হওয়ায় ইলামবাজারের রংবড়ির একটা দুর্ণাম হইয়াছিল। কতকগুলি দুষ্ট দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, ৬ ভাগ রজনের মধ্যে ৫ ভাগ, আবার কখনও কখনও সমস্তই, পুষ্করিণীর পলি মিশাইতে লাগিল। অবশ্য গৌণ হিসাবে ইলামবাজারের পচা পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার হইতে লাগিল বটে, কিন্তু এই কপটাচরণ শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িল, এবং ফলে গালার রংএর কারবার একেবারে লুপ্ত হইল। ২।১টি কারখানায় অবশ্য অল্প পরিমাণে রং বড়ি প্রস্তুত হইতেছিল, ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে রংবড়ির শেষ কারখানাটিও বন্ধ হইয়াছে।

গালার খেল্‌না।

গালার কারবারে একটা বিশেষত্ব এই যে ইহার কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় না। বস্ত্র নির্ম্মিত থলে হইতে গালা গলিয়া বাহির হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে গালার গাদ বা 'কিরি' বলে। এই গাদ নুরী দিগকে বিক্রয় করা হয়। নুরীরা এই কিরি প্রথমতঃ ঢেঁকিতে কুটিয়া পাত্‌লা চূর্ণে পরিণত করে এবং চাল্‌নী দ্বারা তাহা হইতে কাঁকর, কাঠের কুচো প্রভৃতি পদার্থ বাছিয়া ফেলে। তার পর বালুকা বিহীন পলি মাটি চাল্‌নিতে চালিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া খাপড়ার আগুনে গলাইয়া 'করার' নামক workable material প্রস্তুত করে। এই করার হইতে চুড়ী ও নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত হয়।

চুড়ী ও খেলনা প্রভৃতি রং করিবার জন্ম নুরীরা বিশুদ্ধ পাতগালা ব্যবহার করে। বাঁশ ও কাঠের কাঠিতে বিবিধ রং মিশ্রিত গালা লাগাইয়া রাখা হয়,

এবং আবশ্যক মত এই কাঠিতে লাগান রং আগুণে তাতাইয়া খেলনা প্রভৃতি রং করা হয়।

চুড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য এক প্রকার কাঠের ছাঁচের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সমস্ত গালার দোয়াত, রুল হ্যাণ্ডেল প্রভৃতি, এবং আম, আনারস, পেয়ারা, ডাব, তাল, নেবু প্রভৃতি নানাবিধ ফল দেখিতে পাই তাহার কোনটিই ছাঁচে নির্ম্মিত নহে। ছাঁচের অভাবই ছাঁচ ব্যবহার না করিবার কারণ। এবং যে সমস্ত কারণে ইলামবাজারের গালার খেল্না বাজারে সে রূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে এই ছাঁচের অভাব। এই কারণে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খেল্না বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতে পায় না; এবং তাহা তৈয়ারী করিতে, অত্যন্ত বিলম্ব হয়। একজন নুরী কারিকর সমস্ত দিন কার্য্য করিয়া ৸৹ আনা মূল্যের খেলনা তৈয়ারী করে তাহাতে খরচ বাদ তাহার পারিশ্রমিক ।৹ আনা মাত্র থাকে। খেল্নার কারবারে কোন সময়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার নিয়োগ হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস যে চেষ্টা করিলে খেল্নার ব্যবসায়ের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং বেশ লাভ জনক কারবারে পরিণত হইতে পারে।

আল্তা।

রং গালার কারবার উঠিয়া গেলেও, আজকাল গালা প্রস্তুত করিবার কালীন নাদও পাতনায় যে রঙিন জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাও কার্য্যে লাগান হয়। lac dyc তৈয়ারী করিবার সময় সাজিমাটি মিশ্রিত জল ব্যবহারে আসিত না বটে কিন্তু আজ কাল আর ২ প্রকারের নাদ ব্যবহৃত হয় না। একই নাদে উভয়বিধ সংশোধন ক্রিয়া সাধিত হয়। চতুর্থ বা পঞ্চম বার শোধনের পর যে রঙিন জল অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিত অল্প পরিমাণ ফট্‌কিরি মিশ্রিত করা হয়। এই ফটকিরি ও সাজিমাটি মিশ্রিত জল বড় বড় উনুনে জ্বাল দিয়া ঘন করিলেই আলতা রাঙাইবার রংএ পরিণত হইল।

সাদা আল্তা ইলামবাজারেই প্রস্তুত হয়। নুরী স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক কার্য্য সমাপনান্তর সাদা আল্তা তৈয়ারী করে। এই আল্তা তৈয়ারী করিবার জন্ত শিমুল তুলা লাগে, একটি মাটির পাত্রে বিরি কলাই খুব মিহি করিয়া বাঁটিয়া জলের সহিত গুলিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া রাখা হয়; সম্মুখে একটি ছোট ভাঁড় উল্টা করিয়া রাখা হয় এবং নিকটে একটি

'টোকায়' শুক্‌নো শিমুল তুলা থাকে। নুরী স্ত্রীলোকেরা এক থাবা করিয়া ভিজা তুলা লইয়া তাহা উল্টা ভাঁড়ের পিঠে রাখে এবং অল্প পরিমাণ শুষ্ক তুলা সংযোগে তাহা পিটাইতে থাকে। ২।৩ বার ঘুরাইলেই আল্‌তাটি গোলাকার আকার ধারণ করে। সমস্তদিন এইরূপ আল্‌তা প্রস্তুত করিয়া, রাত্রিতে পরিষ্কার জলে আল্‌তাগুলি সিদ্ধ করা হয় এবং পরদিন তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া ২০টি করিয়া 'গত' বাঁধিয়া রাখা হয়। এইরূপ এক শত 'গতে' এক 'বিশে' হয়। গালার কারখানার অধিকারীগণ টাকায় এক বিশে হিসাবে এই সাদা আল্‌তা ক্রয় করে। দুইজন নুরী স্ত্রীলোক তিনদিন কায করিলে ১৲ টাকা মূল্যের সাদা আল্‌তা প্রস্তুত করিতে পারে।

কারখানায় এই সাদা আল্‌তাকে এক একটি করিয়া রংএর নাদে চুবাইয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। তিনবার এইরূপ করিলে বাজারে বিক্রয়োপযোগী রঙিন আল্‌লা তৈয়ারী হয়। স্ত্রীলোকেরা এই রংকরা আল্‌তা ২০টি করিয়া তাড়া বাঁধিয়া রাখে। ইলামবাজারে তৈয়ারী আল্‌তাগুলি অতিশয় ছোট। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মির্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থানে খুব বড় বড় আল্‌তা প্রস্তুত হয়।

নুরীজাতি।

গালার কারবারের বিবরণে নুরীজাতির বিবরণ স্থান না পাইলে তাহা সম্পূর্ণ হইবে না। এই জাতিটি বীরভূম জেলার মধ্যে ইলামবাজার এবং হেতমপুর এই দুইটি গ্রামে বাস করে। হেতমপুরে ১৮।২০টি পরিবারের বাস এবং ইলামবাজারে পূর্ব্বে ৬০।৭০ পরিবার নুরীর বাস ছিল।

ঠিক কোন সময়ে নুরীরা বীরভূমের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছিল তাহা সটিক অবগত হওয়া যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে গালার কার-বার ইলামবাজারে যতদিনের হইল অন্ততঃ ততদিন হইতে নুরীজাতি বীরভূমে বাস করিতেছে।

'নুরী' শব্দটির উৎপত্তির জন্য বেশী দূরে যাইতে হইবে না। পাটনা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাহারা গালার কার্য্য করে তাহাদিগকে 'লাহেরী' বলে; লাহেরী হইতে 'লোরী' বা 'লারী' এবং তাহা হইতে 'নরী" বা 'নুরী'রূপে পরিবর্ত্তন একেবারে অস্বাভাবিক নহে। অন্য কোন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার অভাবে আমাদের এই উৎপত্তি নির্ণয় গ্রহণে কোন বাধা নাই।

বর্ত্তমানে, বীরভূমের পূর্ব্বোক্ত গ্রাম ব্যতীত, বর্দ্ধমান জেলার দীনগর, নূতন হাট রায়গাঁ প্রভৃতি গ্রামে হুগলী জেলার থানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রামে মুর্শিদা-বাদ জেলার কাগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এবং কলিকাতাতে নুরীদের বসতি আছে। সর্ব্বত্রই উহাদিগকে নুরী এই নামে অভিহিত করা হয়। তাহাদিগকে নুরী কেন বলা হয় এবিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর তাহারা নিজে দিতে পারে না। পশ্চিমে 'লাহেরী' শব্দ হইতে 'নুরী' এই শব্দটি আসিয়াছে একথা তাহাদিগকে বলায় তাহারা বলে যে পশ্চিমে লাহেরীদের সহিত তাহাদের আহার ব্যবহার চলে

না। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় 'পালনে' নামে আর এক সম্প্রদায় লোকে তাহাদের মত গালার কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। তাহাদের সহিতও মুরীদের কোনরূপ কুটুম্বিতা বা আহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। বীরভূম জেলায় মুরীদিগকে জল আচরনীয় জাতি মধ্যে গণ্য করা হয় না; হুগলী ও কলিকাতায় তাহাদের জল চলে। সামাজিক আচার ও রীতিনীতিতে ইহাদের সহিত 'নবশাখ'দের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ; সাঙ্গা চলে না; ৯।১০ বৎসরের মধ্যেই বালিকাদের বিবাহ হয়। মাছ মাংসের চলন আছে, তবে অন্য কোনরূপ নিষিদ্ধ আহারের প্রচলন নাই।

সাধারণতঃ গৈঁতালি, ভদ্র, সেন, দাস, লাহা, এবং মহলন্দ, মুরীদের এই এই ৬ প্রকার উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। গৈঁতালি ছাড়িয়া আজকাল অনেকে 'শুঁই' উপাধি গ্রহণ করিতেছে। মুরীদের চারি প্রকার গোত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়; গৈঁতালি উপাধিধারীদের গোত্র বিষ্ণু, ভদ্রদের বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ, সেনদের কুম্ভ, দাসদের বশিষ্ঠ এবং মহলন্দদের মহেন্দ্র কেহ কেহ বলে মাহেন্দ্র। মুরীরা বলে যে তাহারা জাতিতে মণিবনিক—একথাটার ভিত্তিতে কতটুকু সত্য নিহিত আছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। মুরীদের ক্রিয়াকর্ম্মে বর্দ্ধমান জেলা হইতে আগত ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করিয়া থাকে এবং ইহাদের ব্রাহ্মণ গুরুও আছে।

পূর্ব্বে প্রত্যেক মুরী পরিবারের গালা প্রস্তুত করিবার কারখানা ছিল। এখন যে দুইটি কারখানা ইলামবাজারে বর্ত্তমান সে দুটি গন্ধবণিকদের দ্বারা পরিচালিত। মুরী পুরুষেরা গালার খেলনা ও চুড়ী তৈয়ারী করিয়া জাতিত্ব বজায় রাখিতেছে। পূর্ব্বেউক্ত হইয়াছে যে মুরী স্ত্রীলোকেরা সাদা আলতা তৈয়ারী করিয়া পারিবারিক আয়বৃদ্ধির সহায়তা করে। গালার কারবারের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক মুরীকে চাষবাসকে প্রধান উপজীবিকা করিতে হইয়াছে।*

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত।

* আমার বিবরণ এই পর্য্যন্ত লিখিত হওয়ার পর, ইলামবাজারের সন্নিকট গঙ্গাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ খাওাইত মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার পুত্র, সদর লোক্যাল বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনারায়ণ খাওাইত মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজীতে লিখিত ইলামবাজারের বাণিজ্য বিষয়ক একটি 'নোট' আমার হস্তগত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ বাবু ইলামবাজারের ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির দেওয়ান ছিলেন। এই নোট জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমাবল্লভ মিশ্র এম, এ, মহোদয়ের অবগতির জন্য সংকলিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবু আমাকে এই নোট যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে সাহেবদের ও ক্যাক্টরী গৃহের ফটোগ্রাফগুলি আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। পারান্তরে আমরা এই সমস্ত উপকরণের, সংক্ষিপ্ত পরিচয় বীরভূমির পাঠক বর্গকে উপহার দিব। লেখক।